উদ্ভিদ বার্তা
[বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির বাংলা মুখপত্র]
৩০তম বর্ষ ১ম সংখ্যা আষাঢ় ১৪২২/জুন-২০১৫

প্রধান সম্পাদক
ড. মো: আবুল হাসান

সম্পাদক বৃন্দ
প্রফেসর ড. শামীম শামছি
প্রফেসর ড. শেখ শামীমুল আলম
প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ হারুন চৌধুরী
প্রফেসর ড. সালেহ আহমেদ খাঁন

উদ্ভিদ বার্তার উপদেষ্টা কমিটি
প্রফেসর খুরশিদা বানু ফাত্তাহ
প্রফেসর জাহেদউদ্দিন মাহমুদ খান
প্রফেসর হাসনা হেনা বেগম
এস. এম. মাহবুবর রহমান
মোঃ সায়েদুর রহমান
জামাল এ নাসের

ড. মো: আবুল হাসান কর্তৃক
বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি
কার্যালয়, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত

এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারী প্রেস,
৪৩/১০ সি, স্বামীবাগ, ঢাকা থেকে
মুদ্রিত।

মূল্য ঃ বিশ টাকা মাত্র

সম্পাদকীয়

প্রতিসংখ্যা প্রকাশনার সাথে সংক্ষিপ্ত হলেও সম্পাদক ব্যক্তিটির কিছু লিখতে হয়। সম্পাদকীয় আবশ্যক না হলেও এটি একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে। রীতি অনুযায়ী এই লেখা।

এবার জুন সংখ্যা লেখার স্বল্পতা আগের মতোই রয়ে গেল। আমাদের লোকজন সম্ভবত: এ ধরনের লেখায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন, কারণ এতে না আছে প্রচার-প্রসার না আছে সম্মানী ও প্রোমোশনাল পয়েন্ট। এছাড়াও সম্ভবত: উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা প্রায় সবাই প্রচার বিমুখ। কারণ একাডেমিক সাফল্যের খবরটাও তারা প্রচার করতে চান না। আর তাই ১ম শ্রেণিতে ১ম প্রথম স্থান অধিকার এ জাতীয় সংবাদগুলোও তারা নিজ থেকে পাঠাতে আগ্রহ দেখান না।

গত সংখ্যার মতো এ সংখ্যাও কয়েকজন লেখকের লেখা দিয়েই পূর্ণ করতে হলো, যদিও এটা প্রত্যাশিত নয়। আশা করি ভবিষ্যতে লেখার অভাব হবে না। আমাদের সম্পাদনা পরিষদ এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ সুন্দর সুন্দর লেখা নিয়ে এগিয়ে আসবেন এই প্রত্যাশা করছি।

সূচীপত্র

বাংলার বনৌষধি ৩
ড. মো: আবুল হাসান

হৈমান্তী একটি বৃক্ষের নাম ১০
ড. মোঃ আবুল হাসান

শয়তানের সিগার (Devil's cigar): বিশ্বের একটি ব্যতিক্রমী ছত্রাক ১৩
প্রফেসর ড. ফারজানা আশরাফি নীলা

ঘৃণ্য স্বর্ণলতা ১৪
ড. নিশীত কুমার পাল

নাথানিয়েল ওয়ালিচ ঃ প্রখ্যাত উদ্ভিদ সংগ্রাহক ১৬
ড. নিশীথকুমার পাল

Aspersillus niger ১৮
প্রফেসর ড. শামীম শামছি

ভেষজ বর্ণমালা-১ ১৯
ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান

স্টাডী ট্যুর কড়চা ২৭

কৃতি মুখ ২৯

উদ্ভিদ বার্তার জন্য লেখা

উদ্ভিদ সম্পর্কিত যে কোন বিষয় ভিত্তিক নিবন্ধ, খবর, তথ্য, উদ্ভিদ সংগ্রহ, শনাক্তকরণ, সংরক্ষণ, অনুসন্ধান, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, আবিষ্কার, ইত্যাদি লেখা বার্তায় প্রকাশ করা হয়।

লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত বা হাতে লেখা হতে হবে। তবে সিডি বা পেনড্রাইভের মাধ্যমে পাঠানো লেখা অগ্রধিকার পাবে। পাণ্ডুলিপি পাঠানোর সময় অবশ্যই কপি রেখে পাঠাবেন। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখার মানই বার্তায় প্রকাশের মানদণ্ড এবং এ ব্যাপারে সম্পাদক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। লেখা পাঠাবার পর দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পরও ছাপা না হলে লেখা অমনোনীত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

লেখার জন্য সম্মানী দেয়া হয় না।
বার্তায় প্রকাশিত লেখার মতামত সম্পূর্ণভাবে লেখকের।
সম্পাদক মণ্ডলী বা সোসাইটির মতামত নয়।

উদ্ভিদ বার্তার গ্রাহক হোন

বছরে দুইটি সংখ্যা বার্তা প্রকাশিত হয়।
এককালীন ২০০ টাকা দিয়ে জীবন গ্রাহক হওয়া যায়।

চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা

সম্পাদক, উদ্ভিদ বার্তা
বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি কার্যালয়,
উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

প্রতি সংখ্যা বার্তার মূল্য ২০.০০ টাকা।

বাংলার বনৌষধি

ড. মোহঃ আবুল হাসান

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি জনবহুল ছোট দেশ। এখানে ঘনবসতির পাশাপাশি জন্মে অসংখ্য প্রজাতির গাছপালা। তাই কেবল মানব সম্পদেই নই, বনৌষধি সম্পদেও আমরা সমৃদ্ধ। আমাদের মোট প্রায় চার হাজার প্রজাতির গাছপালার মধ্যে কারো কারো মতে প্রায় অর্ধেকই ঔষধি গুণ সম্পন্ন। গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত বনৌষধির সংখ্যাও একেবারে কম নয়, কয়েকশত তো হবেই। এসব বনৌষধি সমুহের ভেষজ গুণ সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে। এখানে **পাঁচটি** বনৌষধি উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ব্যবহার বিধি তুলে ধরা হলো।

(১) ঠনা/থনা/কানাইডিঙ্গী

Oroxylum indicum (L.) Kurz, for. Fl. Brit. Burma 2:237(1877).

সমনাম: *Bignonia indica* L. (1753),

Bignonia pentandra Lour. (1790),

Calosanthes indica (L.) Blume (1826).

ইংরেজী নামঃ Midnight horror, broken bones plant, Indian trumpet flower.

স্থানীয় নামঃ ঠনা, থনা, কানাইডিঙ্গি, সোনাপাতা (বাংলা) আয়াফাং, হোনাগুলু গাছ, থনা গুলু গাছ (চাকমা), থনা গাছ, তাইতা, এগারুহ (মারমা)।

বর্ণনাঃ এটি একটি সরল পত্রঝরা বৃক্ষ, সাধারণতঃ ১৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। কান্ডের বাকল পিঙ্গল, ঝরা পাতার দাগ থাকে। পাতা চারা অবস্থায় সরল, ক্রমান্বয়ে যৌগিক পাতায় রূপান্তরিত হয়। পূর্ণবিকশিত পাতা সচূড় পক্ষল যৌগিক, ৩-৪ প্রস্থ যৌগিক। একটি পূর্ণাঙ্গ যৌগিক পাতা ২ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। কোন উপপত্র নেই, পত্রক ডিম্বাকার থেকে আয়তকার, ৪-১১ × ৩-৯ সেমি. গোড়া বাঁকা, শীর্ষ সরু ও লম্বা, কিনার অখন্ড। মঞ্জরী খাড়া রেসিম, কান্ডশীর্ষ, ১.৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। ফুল উভলিঙ্গ, এক প্রতিসম, বৃন্ত ২-৪ সেমি লম্বা, উপমঞ্জরীপত্র আছে। বৃতি ক্যাম্পানুলেট, ২-৪ সেমি লম্বা, বাদামী বা বেগুনী। পাপড়ি ফানেল আকৃতির, প্রায় ১০ সেমি. লম্বা, ৫ খন্ড বিশিষ্ট, আংশিক অসম। কিনার কোচকানো, বাইরের দিকটা লালচে বর্ণের, ভেতরের দিকটা হলুদ বা পিংক। পুংকেশর ৫টি, দলমন্ডলের গলায় যুক্ত। গোড়া রোমশ। গর্ভাশয় অধিগর্ত, ২-প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। প্রতি প্রকোষ্ঠে অনেক ডিম্বক থাকে। ফল ঝুলন্ত, নৌকা বা তলোয়ার আকৃতির ক্যাপসুল, ৪৫-১২০ সেমি. পর্যন্ত লম্বা এবং ৬-১০ সেমি পর্যন্ত প্রস্থ হতে পারে, কাষ্ঠল। বীজ অনেক হালকা, সাদাটে পাখা বিশিষ্ট। বীজ অঙ্কোরোদগম মৃৎভেদী।

অনেক সময়ই পাতাবিহীন গাছে ফল ঝুলতে থাকে। ফুল রাত্রিতে ফোটে। সূর্যোদয়ের আগেই দলমন্ডল ঝরে যায়। সাধারণত বাদুর দিয়ে পরাগায়ন ঘটে।

গুণাগুণঃ এর বাকল তিতা। কান্ড ও মূলের বাকলে Baicalein, scutellarein, oroxylin, chrysin এবং P-coumaric acid থাকে। পাতায় ফ্ল্যাভনয়েড Baicalein, Scutellarein এবং গ্লাইকোসাইড Baicalin ও scutellarin আছে। বীজে Baicalein এবং oroxindin আছে। এছাড়া Lapachol ও Aloe-emodin ও পৃথক করা হয়েছে।

কান্ড ও মূল বাকলের ডাইক্লোরোমিথেন নির্যাস গ্রাম পজিটিভ *Bacillus subtilis* ও *Staphylococcus aureus*; গ্রাম নেগেটিভ *Escherichia coli* এবং *Pseudomonas aeruginosa* ব্যাকটেরিয়া এবং *Candida albicans* নামক একটি ঈস্টের বিরুদ্ধে বেশ কার্যকরী। Lapachol গ্রামপজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে সমপরিমান *Streptomycin* এর সমান কার্যকরী। Chrysin *Pseudomonas aeroginosa* ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে সমপরিমান Streptomycin এর সমান কার্যকরী।

Baicalin মানুষের T-cell leukaemia virus type-1এবং HIV-1 virus এর বিরুদ্ধে কার্যকরী। ফুলের মিথানোল নির্যাসের অ্যান্টিটিউমার গুণ আছে।

মোট কথা এটি অ্যান্টি-ভাইরাস এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামাটরী গুণ সম্পন্ন ।

সাধারণ ব্যবহারঃ বাকল সাধারণত পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অসুখে ব্যবহৃত হয় । এর ধারক (astringent) ক্ষমতা এবং টনিক হিসেবে সুপরিচিত । ডাইরিয়া এবং ডিসেনট্রিতে এর ব্যাপক ব্যবহার আছে । পাকস্থলীর বেদনায় মালয়েশিয়াতে এর পাতার ক্বাথ পান করা হয় । প্লীহা (spleen) বড় হয়ে গেলে বাকলের ক্বাথ ব্যবহার করা হয় । বাত এবং অন্যান্য ফোলা নিরাময়ে বাহ্যিকভাবে এটি ব্যবহার করা হয় । পাতার poultice মাথা ব্যাথা ও দাঁত ব্যাথায় প্রয়োগ করা হয় ।

জাভাতে এর বাকলের গুঁড়ো পানিতে মিশিয়ে রক্ত পরিষ্কারক হিসেবে এবং পাকস্থলীর গ্যাস তৈরী রোধে ব্যবহার করা হয় ।

ফিলিপাইনে এর মূলের ক্বাথ বাত প্রতিরোধক (antirheumatic), আমাশয় প্রতিরোধক এবং মূত্রকর হিসেবে ব্যবহৃত হয় । এর পাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে গোসল করানো হয় বাতের ব্যথা নিরাময়ের জন্য ।

থাইল্যান্ডে এর মূল টনিক হিসেবে, অ্যান্টি ডাইরিয়্যাল এবং অ্যান্টিডিসেট্রি হিসেবে ব্যবহার করা হয় । কান্ডের বাকল আলসার ও ফোড়ায় প্রয়োগ করা হয় । এর বীজ ল্যাক্সেটিভ এবং কফ নিঃসারক হিসেবে ব্যবহৃত হয় ।

ভিয়েতনামে লোকজ ঔষধ হিসেবে এর বীজের ক্বাথ কফ, ব্রঙ্কাইটিস এবং গ্যাস্ট্রাইটিস (পাকস্থলীর গ্যাস তৈরি)-এ ব্যবহার করা হয় । বাহ্যিকভাবে বীজ আলসার নিরাময়ে ব্যবহার করা হয় । মূল ও কান্ডের বাকলের শুকনো গুড়োর ক্বাথ (decoction) এলার্জি রোগ, আর্টিকারিয়া, জনডিস, অ্যাজমা, গলায় ঘা, স্বরভঙ্গ, পাকস্থলীতে গ্যাস সৃষ্টি, ডাইরিয়া ও ডিসেন্ট্রিতে ব্যবহার করা হয় ।

এর কচি ফুলের কলি, ফুল এবং কচি ফল সবজি হিসেবে খাওয়া হয় আমাদের চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলসহ এশিয়ার বহু দেশে ।

বিশেষ ব্যবহার

কানে পূঁজঃ এর কান্ডের বাকল বাটা দিয়ে তৈরী তেল কানে দিলে কানের পূঁজ পড়া বন্ধ হয় । **তৈল তৈরির নিয়মঃ** ৫০ গ্রাম তিল তেল কড়ায় গরম করে এর সাথে ৫০ গ্রাম বাকল বাটা দিয়ে নাড়তে হবে । বাকলের পানি টুকু নিঃশেষ হলে গেলে কড়াই নামাতে হবে এবং ছেঁকে ওষধিতেল শিশিতে ভরে নিতে হবে । এই তেল পূঁজ হওয়া কানে প্রতিদিন একবার তুলি সাহায্যে অথবা ড্রপ করে দিতে হবে ।

শরীরের কোন অঙ্গ ফোলা : বাকল বেটে সামান্য গরম করে ফোলা জায়গায় প্রলেপ দিতে হবে । এতে ফোলা কমে যাবে ।

বাতরোগঃ কটিবাত, গেঁটেবাত, গোড়ালিবাত ইত্যাদি বাত রোগে বাকল সিদ্ধ উষ্ণ পানি দিয়ে গোছল করলে বা আক্রান্ত স্থানে পানি ঢাললে আরাম পাওয়া যায় ।

কোষ্ঠকাঠিন্যঃ যাদের, বিশেষ করে অর্শ্বরোগীদের প্রথম মলটা শক্ত হয়, তারা ২৫০ মিলিগ্রাম বীজচূর্ণ বানরলাটির ফলের ভিতরের আঠা ভিজানো পানি সহ সকালে খেলে বিশেষ উপকার পাবেন ।

আমবাতঃ আমবাত, অর্থাৎ যে বাতে শরীরে চাকা চাকা হয়, তাদের বাকলচূর্ণ ১ গ্রাম মাত্রায় গরম পানিতে মিশিয়ে প্রতিদিন তিনবার খেতে হবে । বাকল কাঁচা হলে ১০ গ্রাম থেঁতো করে দুই কাপ পানিতে সিদ্ধ করে এক কাপ আন্দাজ থাকতে নামিয়ে সকাল বিকাল কিছুদিন খেতে হবে ।

রক্ত আমাশয়ঃ মূলের বাকল চূর্ণ ৪ গ্রাম পরিমাণ এক কাপ গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখে ৪/৫ ঘন্টা পর ছেকে সকাল-বিকাল ৩-৪ দিন খেতে হবে ।

অজীর্ণ ও পেট ফাঁপা : কচি ফল ১০ গ্রাম বা শুকনো ফল ৫ গ্রাম বেটে আধাকাপ গরম পানিতে মিশিয়ে ছেকে নিয়ে সকালে বা বিকেলে কিছুদিন খেতে হবে ।

গরুর কাঁধের ঘাঃ কান্ড বা মূলের বাকল হলুদের সাথে বেটে প্রলেপ দিলে গরুর কাঁধের ঘা ও ফোলা সেরে যায় । এই প্রলেপ মচকা হাড় চিকিৎসায়ও উপকারী ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ঠনার ওষুধি ব্যবহার

হাঁপানী (asthma)ঃ হাঁপানী রোগ হলে ঠনার ছাল, দেশী আমড়ার ছাল (*Spondias pinnata*) কাগজী লেবুর মূল (*Citrus aurantifolia*) এবং ভূঁই আমলা (*Phyllanthus niruri*) গাছের রস ১০ মিলি পরিমান প্রতিদিন সেবন করতে হবে ।

শরীর ব্যাথা (Body pain): শরীর ব্যাথা হলে ঠনা মূলের ছাল শিলপাটায় পিষে রস বের করে ৫ মিলি পরিমাণ দিনে ৩ বার সেবন করতে হবে।

শূল বেদনা (Colic): ঠনার ছাল, সজিনার ছাল এবং সর্পগন্ধা মূল এই তিনের রস দিনে তিনবার সেবন করতে হবে। মাত্রা তিন চা চামুচ পরিমাণ।

ডাইরিয়া (Diarrhoea): ঠনার ছালের রসের সাথে পরিমাণ মত মধু মিশিয়ে দিনে ৩ বার সেবন করতে হবে।

গুড়াকৃমি (Hook worm): ঠনার ছাল, তেজপাতা, লং, গোলমরিচ, হলুদ এবং সামান্য লবণ একসাথে বেটে মটর দানার আকারে বড়ি তৈরি করতে হবে। দুটি বড়ি প্রতিদিন, খেতে হবে ৭ দিন।

অন্ডকোষবৃদ্ধি (Hydrocele): মূল বাকলের রস দিনে দুইবার একমাস পর্যন্ত লাগাতে হবে।

জন্ডিস (Jaundice): (i) ঠনা ছাল দিনে তিনবার (৫০ মিলি) খেতে হবে, যতদনি ভাল না হয়।

(ii) ঠনার ছাল এক ভাগ, পানি ৪ ভাগ একত্রে সিদ্ধ করে চার ভাগের এক ভাগ থাকতে নামাতে হবে এবং ছেকে দিনে দুইবার খেতে হবে, ১৫ দিন।

(iii) ঠনার ছাল এবং অড়হড় পাতার রস ১০০ মিলি পরিমাণ প্রতিদিন সকালে ৭ দিন খেতে হবে।

(iv) ঠনার ছালের রস ১০০ মিলি, পরিমাণ মত চিনিসহ দিনে ৩ বার ৭ দিন খেতে হবে।

লিভার দোষ (Liver disorders): ঠনার ছালের রস এবং আদার রস এক সাথে ৪০ মিলি পরিমাণ দিনে ২ বার ১৫ দিন খেতে হবে।

অর্শ (Piles): ঠনার ছাল, গাঁজা গাছের পাতা, আফিম, রসুনের কোয়া এবং মধু মিশিয়ে মটর দানা পরিমাণ বড়ি তৈরি করতে হবে। ২টি করে বড়ি গরম পানিসহ দিনে তিনবার খেতে হবে, যতদিন না সারে।

মূত্রকৃচ্ছরোগ (Strangury): যন্ত্রণাদায়ক বিন্দু বিন্দু প্রশ্রাব হলে ঠনা পাতা বেটে মটর দানা আকারে বড়ি তৈরি করে ১টি করে বড়ি দিনে ৩ বার খেতে হবে ৭ দিন।

টনসিল প্রদাহ (Tonsillitis): ঠনার ছাল এবং পাতার মন্ড সামান্য গরম করে আক্রান্ত স্থানে প্রলেপ দিতে হবে। প্রতিদিন ২ বার, ৩ দিন।

পাগলা কুকুর কামড়ালে (Rabies): ঠনা গাছের ছাল এবং গোল মরিচ এক সাথে পিষে মটর দানা আকারে বড়ি তৈরি করতে হবে। এই বড়ি ১টি করে দিনে তিনবার ২১ দিন খেতে হবে। আক্রান্ত স্থান ঠনা গাছের রস দিয়ে ধুয়ে হবে দিনে একবার, ৭ দিন।

বিশেষ কথা: একজন ক্যান্সার রোগী (গলনালীর ক্যান্সার) আসামের গৌহাটির একটি হাসপাতাল থেকে ১ মাস বাঁচবেন বলে বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছে। জীবনের শেষ চিকিৎসা হিসেবে একজনের পরামর্শে তিনি প্রতিদিন সকাল বেলা ঠনা গাছের মূলের রস খেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ্য হয়েছেন। (প্রবন্ধটি বহু দিন আগে পড়া বলে রোগী, হাসপাতাল ও ডাক্তারের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।)

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের দশমূলারিষ্ট-এর একটি প্রধান উপাদান হলো ঠনা গাছের মূলের বাকল।

তথ্য নির্দেশ: (i) Uddin, S.N. 2006. Traditional uses of ethno medicinal plants of the Chittagong hill tracts. Bangladesh National Herbarium, Dhaka, Bangladesh. 1-992 pp.

(ii) Van Valkenbury J.L.C.H. and Bunyapraphatsara(ed). Plant resources of South-East Asia 12(2), medicinal and poisonous plants. Prosea. Bogor, Indonesia 2002. 1-782pp

(iii) শিবকালী ভুট্টাচার্য: চিরঞ্জীব বনৌষধি, পঞ্চমখন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯

(২) কালোজাম

বৈজ্ঞানিক নাম: *Syzygium cumini*(L.) Skeel.
গোত্র : Myrtaceae
সমনাম : *Eugenia jambolana* Lam.
ইংরেজি নাম :
Blackberry, Indian blackberry, black plum
বাংলা নাম : কালোজাম, জাম

বর্ণনা: জাম মাঝারী থেকে বৃহৎ বৃক্ষ, ৩৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। কান্ড সরল, শাখা-প্রশাখা যুক্ত, ছাল ধুসর বর্ণের। পাতা সরল, বৃন্তক, প্রতিমুখ উপরিপন্ন, আকার ও আকৃতিতে কিছু ভিন্নতা আছে, পত্রফলক ৬-১৭×৩-৯ সেমি, কতটা ইলিপ্টিক-অবলং বা ইলিপ্টিক-ল্যানসিওলেট, মসৃণ, গোড়া কিউনিয়েট, শীর্ষ স্থূল বা সূক্ষাগ্র, শিরাবিন্যাস জালিকা। পুষ্প মঞ্জরীতে অবস্থিত, সবুজাভ সাদা, অবৃন্তক, উভলিঙ্গ, বৃতিনল ২.৫-৫.০ মিলি লম্বা, পাপড়ি সংযুক্ত। পুংকেশর অনেক, ৫ মিলি লম্বা। গর্ভাশয় দুইটি, সংযুক্ত, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুন্ড ১টি। ফল বেরী, ৩×২ সেমি. সবুজ, পাকলে প্রথমে লাল ও পরে কালো হয় এবং রসে পূর্ণ হয়। বীজ একটি।

বাহ্যিক ব্যবহার

১। কাটা স্থানের রক্তবন্ধ করতে: শরীরের কোন স্থান হঠাৎ কেটে গেলে বা ছিড়ে গেলে মধ্যম বয়সী পরিষ্কার জামপাতার রস লাগিয়ে দিলে রক্তপড়া বন্ধ হবে এবং একই সাথে সেখানে পচনসৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না।

২। পচা ঘা: যে কোন পচা ঘা জাম পাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে ঘন ঘন ধুয়ে দিলে ঘা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। জাম ছালের গুঁড়ো ঘা-এর উপর দিয়ে ড্রেসিং করলেও ঘা তাড়াতাড়ি শুকায়।

৩। দাঁতের মাড়ির ক্ষতে: দাঁতের মাড়িতে ক্ষত, দাঁত নড়ে বা একটু রক্ত পড়ে, এমন অবস্থায় জাম ছালের মিহি গুঁড়ো দিয়ে নিয়মিত দাঁত মাজলে দাঁত নড়া ও রক্ত পড়া বন্ধ হবে।

অভ্যন্তরীণ ব্যবহার

১। ডায়াবেটিস রোগে: বীজের গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়। দৈনিক তিনবার খেতে হবে। মাত্রা ৫ গ্রাম। জামের বিচির নির্যাস রক্তে গ্লুকোজের যাত্রা কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখে, গবেষণার তা প্রমাণিত হয়েছে।

২। আমাশয়: জামের কচিপাতার রস সামান্য গরম করে ২/৩ চা চামচ পরিমাণ দিনে ৩ বার খেতে দিলে সাদা বা রক্ত আমাশয় ভাল হয়। অনেকের মতে ছাগলের দুধের সাথে এই রস মিশিয়ে নিলে ভাল। জাম ছালের গুঁড়োর ক্বাথও কার্যকরী। পাতার রসের সাথে ডালিম পাতার রস সমপরিমাণ মিশিয়ে নিলে আরও কার্যকরী হয়।

৩। রক্ত পায়খানা: রক্ত পায়খানা তথা রক্তদাস্ত হলে জাম ছালের রস দুই/তিন চা চামচ পরিমাণ নিয়ে সামান্য ছাগলের দুধের সাথে (অথবা এমনিতে) মিশিয়ে খেলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৪। পিত্তবমি: ৫-৬টি পাতা ১০০ মিলি পানিতে সিদ্ধ করে ছেঁকে নিয়ে পানির সাথে সামান্য মধু সহ সেবন করতে হবে।

৫। রক্তস্বল্পতা ও শারীরিক দুর্বলতা: পাকা জামের রস ১০০ মিলি, এর সাথে সামান্য চিনি মিশিয়ে দিনে দুইবার খেতে হবে। অন্তত: ১৫ দিন খাওয়া উচিৎ।

রাসায়নিক

পাতায় উদ্বায়ী তেল আছে, তাছাড়াও আছে সিটোস্টেরল, প্যারাফিন, বিভিন্ন অ্যাসিড। কান্ডের বাকলে ক্যাম্পফেরল, কুয়ারসেটিন, বিভিন্ন গ্লুকোসাইড, ফ্রিডেলিন, ইউজেনিন, ট্যানিন, রেজিন, স্টার্চ এবং প্রোটিন আছে। বীজ থেকে কার্যকরী রক্তে গ্লুকোজ কমানোর পদার্থ পৃথক করা হয়েছে। বীজ থেকে পাওয়া যায় উদ্বায়ী তেল, ট্যানিন, গ্লাইকোসাইড জাম্বোলিন (jamboline), ফ্ল্যাভোনয়েড ইত্যাদি। ফলের মন্ডে প্রোটিন, ফ্যান্ট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, এ, সি, থায়ামিন, রাইবোফেমাভিন, নিকোটিনিক অ্যাসিড, ফলিক অ্যাসিড, খনিজ পদার্থ, বিভিন্ন অ্যানথোসায়ানিন আছে। গবেষণায় পাতার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল কার্যক্রম প্রমাণিত হয়েছে। পাতা ও কান্ডের বাকলে জাম্বোসাইন (jambosine) অ্যালকালয়েড আছে।

(৩) গুলঞ্চ

বৈজ্ঞানিক নাম: **Tinospora crispa** (L.) Hook. f. পদ্ম গুলঞ্চ

Tinospora cordifolia (Willd.) Hook.f. নিমগুলঞ্চ

ইংরেজি নাম: Moon creeper, bile killer

গোত্র : Menispermaceae

বর্ণনা: গুলঞ্চ একটি লতানো উদ্ভিদ। মাটি থেকে উঠে বৃক্ষকে অবলম্বন করে শাখার উপরে চলে যায়। লতার গায় অর্বুদের মত গঠন থাকে, পাতা পানের মত, হৃদপিন্ডাকার, একান্তর, সরল। লম্বা বোঁটাযুক্ত। মঞ্জরীতে পুষ্প

অবস্থিত। পুং পুষ্প এবং স্ত্রীপুষ্প পৃথক মঞ্জরীতে অবস্থিত। বৃত্যাংশ ৩টি, পাপড়ি ৩টি, পুং পুষ্পে পুংকেশর ৬টি, স্ত্রীপুষ্পে স্ত্রীকেশর ৩টি। ফল হলুদ বা কমালা বর্ণের। গাছটি সারা বছরই পাওয়া যায়, তবে মাত্রাতিরিক্ত আহরণের ফলে ক্রমশ দুশপ্রাপ্য হয়ে উঠছে।

ভেষজগুণ

গুলঞ্চের রস জ্বরনাশক, টনিক, শোধক, মূত্রকর, লিভার-হিতকর, বাতনাশক, পিপাসা নাশক, দুর্বলতানাশক, সকল প্রকার চর্মরোগ নাশক, সিফিলিস উপশম কারক, পাইলস, হাঁপানি, যৌন দুর্বলতা ও জনডিস রোগে উপকারী। এছাড়া অ্যাসিডিটি, প্রশ্রাবের জ্বালাপোড়া, কাশি, হৃদরোগ, গনোরিয়া, ইত্যাদি রোগেও গুলঞ্চের প্রয়োগ দেখা যায়। গ্রাম বাংলার সর্বত্র জ্বর নাশক, রক্ত পরিষ্কারক ও চর্মরোগ নিরাময়ের জন্য তাজা গুলঞ্চের রস (সাধারণত রাত্রিতে ভিজিয়ে রেখে সকাল নেড়ে পানিটুকু) সেবন করা হয়।

কথায় আছে

কল্পনাথ আর পদ্মগুলঞ্চ আছে যেথা
জ্বর কি কভু আসে সেথা!
এটি গ্রাম বাংলার একটি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য।

ব্যবহার

১। *চর্মরোগ* : ৮-১০ গ্রাম তাজা কান্ড থেতো করে ১ কাপ পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে কচলিয়ে পানিটুকু খালি পেটে খেতে হবে।

২। পুরাতন বা জীর্ণ জ্বর: ১০-১২ গ্রাম তাজা কান্ড কুচি কুচি করে কেটে একটু থেতো করে ১ কাপ পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরবর্তীতে কচলিয়ে ছেঁকে পানিটুকু খেতে হবে। প্রতিদিন ২-৩ বার খেলে ভাল। পাতা শাক হিসেবে খেলেও উপকার পাওয়া যায়।

৩। কৃমি রোগ: ১০-১৫ মিলি রস প্রতিদিন ২-৩ বার করে এক সপ্তাহ খেলে পেটের কৃমি বিনাশ হয়।

৪। ডায়াবেটিস : ৩ গ্রাম পরিমাণ ঘি-এ দেড় গ্রাম পরিমাণ গোলঞ্চের রস পাক করে খালি পেটে খেতে হবে।

৫। জন্ডিস: ৩ চামচ রসের সাথে মধু মিশিয়ে দিনে ৩ বার খেতে হবে। কিছুদিন নিয়মিত খেতে হবে।

৬। পাইলস : ৩-৫ চামচ পরিমাণ রস মধুসহ প্রতিদিন ৩ বার খেতে হবে।

৭। মূত্র যন্ত্রের রোগ: ৩-৫ চামচ রস, দুধ বা মধু সহ দৈনিক তিনবার খেতে হবে।

৮। টনিক: গোলঞ্চের কান্ড ভেজানো পানি নিয়মিত খেলে উত্তম টনিক হিসেবে কাজ করে।

৯। ঘামাচি: গরমের সময় শরীরে ঘামাচি হয়। ঘামাচি হলে সম পরিমাণ গোলঞ্চের রস এবং কাঁচা হলুদের রস কয়েকদিন খেলে ঘামাচি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

১০। বাত ব্যথা: দুধের সাথে মিলিয়ে গোলঞ্চের রস কিছুদিন খেলে বাত ব্যথার উপশম হয়।

রাসায়নিক উপাদান

কান্ডে অ্যালকালয়েড Berberine, গ্লাইকোসাইড giloin, giloinin এবং অন্যান্য যৌগ, যেমন-gilenin, sterols, gilosterol, sitosterol, তিক্ত tinosporine, clerodane diterpenoids, tinosporide, lucoside এবং heptacosanol ইত্যাদি বিদ্যমান।
পরিপক্ক কান্ড থেকে শ্বেতসার (স্টার্চ) আহরণ করা যায় যা সাধারণত: ক্রনিক ডাইরিয়া ও ডিসেনটেরি (আমাশয়) রোগে ব্যবস্থা দেয়া হয়। মোটাকান্ড চটকিয়ে সিদ্ধ করলে নিচে যে তলানী পড়ে তা থেকে স্টার্চ পাওয়া যায়।

ঔষধার্থে অধিক ব্যবহৃত হয় পদ্মগুলঞ্চ। পদ্মগুলঞ্চ লতার গায়ে অর্ধুদের ন্যায় অসংখ্য গঠন থাকে। পদ্মগুলঞ্চ অধিক তিক্ত। নিম গুলঞ্চের লতা অর্ধুযুক্ত নয়, এটি কম তিক্ত, তাই ঔষধার্থে কম ব্যবহৃত হয়।

(৪) বড় দুধিয়া

বৈজ্ঞানিক নাম: **Euphorbia hirta** L., Sp.Pl. 1:454 (1753)
গোত্র নাম: Euphorbiaceae
সমনাম: *Euphorbia pilulifera* L. (1753).
Chamaesyce pilulifera (L) small (1903)
Chamaesyce hirta (L.) Millsp. (1909)

ইংরেজী নাম : Asthma weed, snakeweed, Asthma herb. Hairy spurge.

স্থানীয় নাম : বড় দুধিয়া, দুধিয়া, ঘাওপাতা, ক্ষিরণী, কালফুলগাছ (চাকমা), দুতাখের (ত্রিপুরা)

বর্ণনা: ছোট রোমযুক্ত বীরুৎ, কান্ড নরম, সাদা কসযুক্ত, শাখান্বিত। পাতা সরল, প্রতীমুখ, ডিম্বাকার বা ডিম্বাকার-আয়তাকার ১.৫ × ০.৩-২.৫ সেমি, গোড়া তীর্যক বা গোল, শীর্ষ স্থূল, কিনার মিহি করাতদন্তর, বোঁটা খাটো, উপপত্র মুক্ত। মঞ্জরী, কাক্ষিক বা শীর্ষক, সায়াথিয়া সমৃদ্ধ, পুংদণ্ড খাটো, পরাগধানী-হলুদ। ফল ক্যাপসুল, তিন খন্ড বিশিষ্ট, পিরামিডাল, রোমযুক্ত। এটি মধ্য আমেরিকান আগাছা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব দেশেই পাওয়া যায়। বাংলাদেশে এখন প্রাকৃতিকভাবেই জন্মায়।

ভেষজ ব্যবহার: দুধিয়া গাছের কাজ প্রধানত: রসবহ ও রক্তবহ স্রোতে। ইহা শ্বাস, কাস, হাঁপানীতে নিশেষ উপকারী। এছাড়া উদরশূল, ডায়রিয়া, আমাশয়, কৃমি রোগেও ব্যবহৃত হয়। ইহা দুধবর্ধক ও কামোদ্দীপক।

আমাশয় (রক্ত বা সাদা): এই গাছের ক্বাথ ব্যবহার করা হয়। শুকনো গাছ ৩ গ্রাম (তাজা ৫ গ্রাম) ২ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে আধা কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। তা হলেই ক্বাথ তৈরী হবে। এই ক্বাথের অর্ধেক সকালে এবং অর্ধেক বিকালে পানিসহ খেতে হবে। ১০-১৫ দিন খাওয়া উচিত।

অথবা কান্ড ও পাতার সাথে গোলমরিচ বেটে মটর দানার আকারে বড়ি তৈরি করতে হবে। ১টি করে বড়ি দিনে তিনবার পানিসহ খেতে হবে। ১৫দিন খাওয়া উচিৎ।

স্তনে দুধ কমে গেলে: আধা কাপ পরিমাণ ক্বাথ সকালে ও বিকালে খেতে হবে।

শ্বাস ও কাস : কাসি, সঙ্গে হাঁপানীর টান, কফ অল্প বের হয়, এমন অবস্থায় দুধিয়ার ক্বাথ সকাল-বিকাল পানিসহ খেতে হবে।

দাদ হলে: দাদ ভালভাবে পরিষ্কার করে এর কস লাগাতে হবে।

পচা ঘা : পচা ঘায়ে এর কস নিয়মিত কিছুদিন লাগাতে হবে।

কেটে গেলে: শরীরের কোন স্থান কেটে গেলে দুধিয়া বেটে লাগিয়ে দিলে রক্তপড়া বন্ধ হবে, কাটা স্থান দ্রুত সেরে যাবে।

ইন্দ্রিয় শৈথিল্য: দুধিয়ার চূর্ণ ২৫০ মিলি গ্রাম, আধা কাপ গরম দুধ ও ১ চা চামচ চিনিসহ সকাল-বিকাল কিছু দিন খেতে হবে। পথ্য হিসেবে সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করা উচিৎ।

হাঁপানী-সিগারেট: দুধিয়ার পাতা ও থুতরার পাতার চূর্ণ দিয়ে সিগারেট তৈরী করা হয়। যা হাঁপানীর জন্য উপকারী।

দুধিয়ার মিথানল নির্যাস *E.coli, Stephylococcus aureus, Candida albicans* অণুজীবের বিরুদ্ধে কার্যকরী। এই নির্যাস *Shigella* spp. দ্বারা ঘটিত আমাশয়েও কার্যকরী। Quercitin নামক ফ্লাভোনয়েড-এর জন্য এটি কার্যকরী হয়।

ইহাতে quercetin, quercitol, taraxerol, leucocyanidin, cyanidol, beta-amyrin, friedelin, triacontane, 1-hexacosanol, methyl enacyclo-artenol, tenol, cycloartenol, sitosterol, euphorbol, hexacosonate, beta-amyrin acetate, tinyatoxin, phorbol esters, ইত্যাদি জৈব রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান।

* এর প্রধান ব্যবহার শ্বাসনতন্ত্রের রোগে, বিশেষ করে কাসিতে।

গাছের ইথানোল নির্যাস অ্যান্টিপ্রোটোজোয়াল, অ্যান্টি ভাইরাল, স্পাসমোজেনিক এবং অ্যান্টি ক্যান্সার (গনি-২০০৩)

* এটি একটি অতি উত্তম যক্ষানিবারক হিসেবে প্রমাণ করেছে প্রাণ রসায়ন বিভাগের স্বর্গীয় অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন।

(৫) হরীতকী

বৈজ্ঞানিক নাম: Terminalia chebula(Gaertn) Retz.

গোত্র: Combretaceae

ইংরেজী নাম: Chebulic myrobalan, Gall nut.

বর্ণনা: হরীতকী গাছ পত্রঝরা, বৃক্ষ উচ্চতায় ২৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাতা সরল, প্রতিমুখ, ডিম্বাকার বা আয়তকার; ৬-১৫ × ৩-১০ সেমি., গোড়া কতকটা গোলাকার, কিনার অখন্ড-মসৃণ, শীর্ষ সূক্ষ্মাগ্র।
শিরাবিন্যাস জালিকা। শীতের শেষে গাছের পাতা সম্পূর্ণ ঝরে যায় এবং কিছুদিন পর পুনরায় সমস্ত গাছে নতুন পাতা গজায়। মঞ্জরী শীর্ষ বা কাক্ষিক পেনিকল। পুষ্প কতকটা হলদে, ক্ষুদ্রাকার ২ মিমি লম্বা, উভলিঙ্গ, মঞ্জরীপত্র যুক্ত। বৃতি ৫ খন্ড বিশিষ্ট। পুংকেশর ১০টি, ৩-৪ মিলি লম্বা। গর্ভাশয় অধিগর্ভ, গর্ভদণ্ড পুংকেশরের চেয়ে খাটো, গর্ভমুন্ড ১টি। ফল ড্রুপ, ২.৫-৪.০ × ১.৫-৫. সেমি। ফলে বীজ ১টি। এপ্রিল মাসে ফুল আসে এবং নভেম্বর মাসে ফল পাকে।

অনুপান ভেদে ব্যবহার
হারীতকী চূর্ণ লবণসহ খেলে কফরোগ বিনষ্ট হয়।
চিনিসহ খেলে পিত্তরোগ বিনষ্ট হয়।
ঘি-এর সাথে খেলে বাতজ রোগ বিনষ্ট হয়।
গুড়ের সাথে খেলে সবরোগ বিনষ্ট হয়।

ঋতুভেদে অনুপান ভিন্ন হয়
গ্রীষ্ম : গুড়সহ খেতে হবে
বর্ষা : সৈন্ধব লবণসহ খেতে হবে
শরত : চিনিসহ খেতে হবে
হেমন্ত : শুঁঠ চূর্ণ সহ খেতে হবে
শীত : পিপুল চূর্ণসহ খেতে হবে
বসন্ত : মধুসহ খেতে হবে
ঋতু অনুযায়ী অনুপান মিশিয়ে হরীতকীর খোসা চূর্ণ ১ তোলা মাত্রায়, ব্যবহার করলে অধিক উপকার পাওয়া যায়।

১। অন্তর্বলি অর্শে : প্রতিদিন সকালে গুড়ের সাথে অন্তত: ৭দিন খেতে হবে।
২। রক্ত অর্শে : আখের গুড়ের সাথে মিশিয়ে সকালে খেতে হবে।
৩। কোঠ কাঠিন্য : হরীতকী খোসাচূর্ণ ৫ গ্রাম মাত্রায় সমপরিমাণ চিনিসহ রাতে শোবার আগে গরম পানিসহ খেতে হবে।
৪। শোথ রোগে: হরীতকী খোসাচূর্ণ গুলঞ্চের রসের সাথে মিশিয়ে দিনে ৩ বার সেবন করতে হবে। মাত্রা ৫ গ্রাম।
৫। হজম শক্তি হ্রাস পেলে : খাবারের পর সামান্য বিট লবণ মিশিয়ে দৈনিক তিন বার খেতে হবে। মাত্রা ৫ গ্রাম।
৬। হাঁপানী : হাঁপানী রোগে হরীতকীচূর্ণ দিয়ে সিগারেট বানিয়ে টানলে উপকার পাওয়া যায়।

হৈমান্তী একটি বৃক্ষের নাম

ড. মোঃ আবুল হাসান

হৈমান্তী একটি মাঝারী আকৃতির বৃক্ষের নাম। এ নামটি কোথাও খোঁজে পাওয়া যায় না, না বাংলা অভিধানে, না কোন ভেষজ বা বনৌষধি তালিকায়। কোন উদ্ভিদ সংহিতায়ও এ নামটি নাই। না এ বাংলায় আছে, না ওপার বাংলায় আছে। না এটি কোন আঞ্চলিক বা উপজাতীয় নামও নয়। এ নামটি প্রথম শোনি বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে। উত্তরা গণভবনে তিনি এটি লাগাতে চান।

এ নামটি এখন দেখতে পাবেন নাটোরের উত্তরা গণ ভবনের বাগানে। সুন্দর হাতের লেখায় একটি গাছের কান্ডের সাথে লাগানো। ঐ গাছটিই হৈমান্তী। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই হৈমান্তী গাছটি ওখানে লাগানো হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর পশ্চিম পাশে সৃজন করা এক বন-বাগানে পাবেন বেশ কিছু হৈমান্তী গাছ।

মাঝারী উচ্চতার এ বৃক্ষটি অনেকটাই পত্র ঝরা প্রকৃতির। বাঙালী জাতির মতোই সে বেশ অনুভুতি প্রবণ। তাই শীতের তীব্রতা এলেই অভিমানে পাতাগুলো ঝরে যায়; না কী বাঙলার বননির্ভর সন্তানদের জন্য শীতে সামান্য উষ্ণতা দেয়াই তার উদ্দেশ্য। পত্রঝরা শালবন তো এখন মুড়ি শিল্পের প্রধান জ্বালানী সরবরাহকারী। বসন্ত এলেই মলয় মারুত আর কোকিল-এর সহযোগী হয়ে হেসে উঠে হৈমান্তী, শাখা প্রশাখা ভরে যায় সাদা ফুলে, মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চার দিকে। বসন্তের পর আসে গ্রীষ্ম উত্তাপ ছড়ায় সারা প্রকৃতিতে, তাই হৈমান্তী আসে নবপল্লব নিয়ে, হয়ে উঠে ছায়াঘন শান্তির নীড়। হৈমান্তী বাড়ায় বাগানের শোভা, বনের প্রভা। হৈমান্তীর কী আর কোন গুণ নেই? এতে ঘটেছে নানা গুণের সমাহার। এর মূল, কান্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজ এসব ঔষধী গুণ সম্পন্ন। এর ছাল ফল বীজ সবই তিক্ত, কিন্তু বুকে ধারণ করে আছে দুধের নহর। এটি একটি প্রথম সারির ভেষজ বৃক্ষ।

তাই সকল ভেষজ তালিকায়ই একে পাই, তবে এ নামে নয়, অন্য নামে।

হিম শীতল হিমালয়ে এর জন্ম নয়। হেমন্ত কালে ফোটেনা এর ফুল, জন্মে না এর চারা, এরপরও নাম হৈমান্তী। তবুও কেন এমন নাম? নামটি সুন্দর, শ্রুতি মধুর এবং খাঁটি বাংলা। বঙ্গবন্ধু কোথায় পেলেন এমন সুন্দর নাম?

তবে শুনুন। বেশ আগের কথা। চিকিৎসা শাস্ত্র আজকের মতো এতোটা উন্নত হয় নি, যা ছিল তাও আবার ছিল শহর কেন্দ্রীক। অজ পাড়াগাঁ-এ এর ছোঁয়া লাগেনি, ছোয়া লাগা সম্ভবও ছিল না। চিকিৎসা ছিল অনেকটা ঝার ফোঁক, পানি পড়া, না হয় টোটকা। এমনই এক সময়ে সেই গ্রাম বাংলার অজ পাড়া গাঁ-এ হৈমান্তী নামের একটি ছোট্ট মেয়ের দেখা দেয় আমাশয়। মরণ ব্যাধি রক্ত আমাশয় (বর্তমানে যাকে বলা হয় অ্যামিবিক ডিসেনট্রি)। ঝার-ফোঁক, পানি পড়া, টোটকা সব চিকিৎসাই করা হলো। কিন্তু কিছুতেই রোগ সারছে না। সারা বাড়ির মানুষ, সারা পারার মানুষ, শেষ পর্যন্ত সারা গ্রামের মানুষ যার যা জানা আছে তাই করতে লাগলো। ক'দিন আগেও যে মেয়েটি সারা গ্রাম ঘুরে বেড়াতো, আজ তার দেহখানি বিছনার সাথেই মিশে গেছে। এই বুঝি প্রাণ যায়! মসজিদ মন্দিরে মানত হলো, কিন্তু কোন কিছুই কাজে আসছে না, অবস্থা ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। মেয়েটির মা শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি কর্তার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইলো। এটা জীবনের শেষ চাওয়া। সারা রাত্রি সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে কান্নাকাটি, কাকুতি মিনতি করে এক সময় নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন মা।

হঠাৎ এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হলো সেখানে। মহাপুরুষ হৈমান্তীর মাকে ডেকে বললো তোর 'কান্নাকাটি আর কাকুতি-মিনতিতে সৃষ্টিকর্তার দয়া হয়েছে। তোর মেয়ে ভালো হয়ে যাবে। ঘরের পেছনে একটি গাছ দেখিয়ে বললেন, এই গাছের বাকলের রস একটু একটু করে কিছুক্ষণ পর পর মেয়েকে খাওয়া। সকালে ঘুম ভাঙ্গলে মার স্বপনের কথা মনে পড়লো। ছুটলো ঘরের পিছনে। গিয়ে ঠিকই স্বপনের দেখানো গাছটির দেখা পেলো। বহুদিন ধরেই গাছটি এখানে আছে, কেউ তার সঠিক নাম বা কোন গুণ জানে না। যাই হোক মনে ভীষণ আশা নিয়ে হৈমান্তীর মা গাছের ছালের রস একটু পর পর খাওয়াতে লাগলো। বাস দু'দিনেই মেয়েটি সেরে উঠলো। মা এ গাছটি নাম রাখলেন হৈমান্তী, তার মেয়ের নামেই নাম।

তারা দুজনে দুজনার বন্ধু। হৈমান্তী এদের দুজনেরই প্রতিনাম বা হোমোনিম।

নিশ্চয়ই ঘটনাটি বঙ্গবন্ধুর এলাকার। না হলে তিনি এতো সুন্দর নামটি কোথায় পেতেন?

আরেকটি কথা। আমাদের জাতীয় ফুল আছে, জাতীয় ফল আছে, জাতীয় বৃক্ষ আছে। একটি জাতীয় ভেষজবৃক্ষ করা যায় কী? তাহলে বঙ্গবন্ধুর হৈমন্তীর কথা চিন্তা করা যায়।

পাঠকবৃন্দ, আসুন এবার হৈমন্তীর ভেষজ নাম ও ভেষজগুণ সম্বন্ধে জানি।

এর ভেষজনাম কুড়চি

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Holarrhena antidysenterica* (L.) Wall. ex Decne (1844)

সমনাম : *Nerium antidysentericum* L. (1753) *Holarrhena pubescens* wallich ex G. Don (1837)

H. malaccensis Wight (1848)

অন্যান্য নামঃ ইদ্র যব (সাধারণতঃ এর বীজকে বলা হয়), কুটজ, কুটিশ্বর (ঢাকা-টাঙ্গাইল অঞ্চলের নাম)।

ইংরেজি নামঃ Tellicherry, Kurchi, Holarrhena

গোত্র নামঃ Apocynaceae

গুণাগুণঃ অন্ত্রনালীর দূর্বলতায় ও রক্তপিত্ত দোষের রোগে বিশেষ উপকারী। রক্ত আমায়শ-এ বিশেষ কার্যকরি। এটি ক্ষত নাশক, কৃমি নাশক, জ্বর নাশক, ধারক, আমাশয় নাশক এবং পাকস্থলীর দুর্বলতা নাশক।

বর্ণনাঃ কুড়চি মাঝারি আকৃতির বৃক্ষ। পাতা সরল, মসৃণ, ডিম্বাকার-উপবৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার-আয়তকার, শীর্ষ সূক্ষ্মাগ্র, পার্শ্বশিরা ১০-১৬ জোড়া, পত্রবৃন্ত ছোট। পাতা ঝরে যাবার পর বসন্ত কালে মঞ্জরীতে ফুল আসে। ফুল সাদা, বৃতি সবুজ, বৃত্যাংশ ৫টি, দল খন্ড বাম দিকে পাকানো, পুংকেশর দলনলের গোড়ার দিকে অবস্থিত, গর্ভকেশর ২টি, ফল লম্বা ফলিকল, বীজ বাদামী রোমশ। বর্ষায় ফল হয়, হেমন্তে পরিপক্কা হয়। পরবর্তী শীতকালে ফেটে যায়।

কখনো কখনো কোন কোন গাছে দ্বিতীয় ফুল আসে হেমন্ত কালে। গত ৪০ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাত্র একবার (২০১৩) এমনটি দেখেছি। একটি গাছের ডাল ছাঁটা ছিল, অপর একটি গাছের একটি ডালের পাতা ঝরে গিয়েছিল সেখানে ফুল এসেছিল দ্বিতীয় বার।

কিংবদন্তীঃ ইন্দ্রদেব যখন হনুমানকে অমৃত খাইয়ে জীবিত করেন তখন এক ফোঁটা অমৃত মাটিতে পড়ে যায়, সেই অমৃত মাটি থেকে কুড়চি গাছের জন্ম।

ব্যবহার

১। রক্ত আমাশয় : ১০ গ্রাম বাকল আধাচূর্ণ করে (বা ছোট ছোট করে কেটে) ৪ কাপ পানিতে সিদ্ধ করতে হবে। পানি কমে ১ কাপ পরিমাণ হলে নামিয়ে ঠান্ডা করতে হবে এবং ছেঁকে সকাল বিকাল খাওয়াতে হবে। ২/৩ দিনেই রোগ সেরে যাবে।

২। মুখের ক্ষতঃ ১০ গ্রাম বাকল ৪ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে ১ কাপ পরিমাণ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। সিদ্ধ পানি মুখে ৫/৭ মিনিট রাখতে হবে এবং ধীরে ধীরে কুল কুল বা গড়গড়া করতে হবে। প্রতি দিন ৩/৪ বার করতে হবে।

শরীরের অন্য স্থানের ক্ষত এই পানি দিয়ে ধুয়ে দিলেও ক্ষত ভাল হয়ে যাবে।

৩। মুত্র কৃচ্ছঃ প্রস্রাব কমে যাওয়া ও ব্যাথাযুক্ত হওয়া। এরূপ হলে ১০ গ্রাম কুড়চি ছাল ১ গ্লাস পানিতে রাত্রিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং সকালে ছেঁকে নিয়ে ১ ঘন্টা পর পর খেতে হবে।

৪। অতিসারঃ পেট যন্ত্রণা, অসাড়ে দাস্ত, রক্তের মিশ্রণ আছে এমন হলে ১০ গ্রাম ছাল ৪ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সকাল বিকাল খেতে হবে।

৫। রক্ত অর্শঃ কুড়চি ছাল ১০ গ্রাম কুচিকুচি করে কেটে ৪ কাপ পানিতে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ঠান্ডা করতে হবে। সকাল-বিকাল খেতে হবে কয়েক দিন। রক্ত পড়া ও যন্ত্রণা কমে যাবে।

৬। কেঁচো কৃমিঃ কুড়চি বীজচূর্ণ ১ গ্রাম মাত্রায় মধুর সাথে মিশিয়ে দিনে দুইবার খাবার আগে খেতে হবে। ৫-৭ দিন খেতে হবে।

৭। কুষ্ঠ রোগ : বীজ মিহিচূর্ণ করে আক্রান্তস্থানে প্রলেপ করে দিতে হবে।

৮। ম্যালেরিয়া জ্বরঃ কুড়চি ছাল চূর্ণ ১ গ্রাম এবং শিউলি পাতা চূর্ণ ১ গ্রাম একত্রে প্রতি ২ বেলা খেতে হবে। কুড়চি ছাল সিদ্ধ পানি দুই বেলা কয়েক দিন খেলেও চলবে।

৯। রক্তকাশিঃ সর্দি কাশি নেই, গলা সুড়সুড় করে রক্ত কাশি এমন অবস্থায় কুড়চি ছাল চূর্ণ ১.৫ গ্রাম মাত্রায় পানি সহ সকাল বিকাল খেতে হবে।

প্রাপ্তি স্থানঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ উঁচু এলাকায় পাওয়া যায়। ঢাকা ময়মনসিংহ বনে প্রচুর জন্মে। দেশের বাইরে উষ্ণ আফ্রিকা, ভারত, মায়ানমার, ক্যাম্বডিয়া, থাইল্যান্ড ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়।

অন্যান্য তথ্যঃ বাকল থেকে প্রায় ৪০-৪৫টি স্টেরয়ডাল অ্যালকোহল পৃথক করা হয়েছে। প্রধান পদার্থ হলো Conessine. অ্যামোবিসিডাল গুণাগুণ Conessine-এর জন্যই হয়ে থাকে। এর ক্লোরোফর্ম ও মিথানলিক নির্যায় *Bacillus subtilis, E. coli, Pseudomonas aeruginosa* এবং *Staphylococcus aureus*-এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। Conessine *Trichomonas intestinalis* এবং *T.vaginalis* এর জন্য বিষতুল্য। কুড়চি ফলের অ্যালকোহলিক নির্যাস মানুষের epidermoid carcinoma of nasopharynx এর ক্যানসার প্রতিরোধ গুণ সম্পন্ন।

বয়স এবং ঋতুভেধে বাকলে অ্যালকালয়েডের পরিমাণে তারতম্য হয়। যখন গাছে নতুন বিটপ (shoot) গজায় তখন বাকলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অ্যালকালয়ে থাকে যা ৪.৩%/পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাতায় এর পরিমাণ ১-১.৬%, মজার কথা হলো পুষ্পিত উদ্ভিদের বাকলে মাত্র ০.৪% অ্যালকালয়েড পাওয়া গিয়েছে কোন কোন পরীক্ষায়।

এর ১ কেজিতে বীজ থাকে ৩২০০০-৩৫০০০টি। ২-৩ সপ্তাহে বীজের অঙ্কুরোদগম হয়। বৎসর পার হলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা দারুণভাবে হ্রাস পায়। অঙ্কুরোদগম ইপিজিয়্যাল।

শয়তানের সিগার (Devil's cigar): বিশ্বের একটি ব্যতিক্রমী ছত্রাক

প্রফেসর ড. ফারজানা আশরাফী নীলা
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সিগার সদৃশ্য মাশরুম, বিশ্বের একটি ব্যতিক্রমী ছত্রাক যা পৃথিবীর শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট তিনটি স্থানে পাওয়া যায়। ইংরেজিতে একে Devil's cigar বা Texas star বলে, যার বৈজ্ঞানিক নাম *Chorioactis geaster*, এটি শুধুমাত্র আমেরিকার মধ্য-টেক্সাস এবং জাপানের মিয়াজাকি এবং কোচি প্রিফেক্টারের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাওয়া যায়। তবে ২০০৬ সালে জাপানের নারা প্রিফেক্টারেও এই ছত্রাকের সন্ধান পাওয়া গেছে। জাপানি ভাষায় একে Kirinomitake বলা হয়। এই অদ্ভুত ছত্রাকটি ১০ সেন্টিমিটার লম্বা এবং এর ক্যাপসিউল কালচে খয়েরি বর্ণের সিগার আকৃতি, যা রেণু নিঃসরণের সময় বিদীর্ণ হয়ে চার হতে সাত বাহু বিশিষ্ট তারকা আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। খুব কম সংখ্যক জানা ছত্রাকের মতো এটিও রেণু নিঃসরণের সময় সুস্পষ্ট হিস্ হিস্ শব্দ করে এবং রেণু মেঘ তৈরি করে।

১৮৯৩ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রতি বছর মধ্য-টেক্সাসের সামান্য কিছু এলাকায় এই মাশরুম দেখা যায়। জাপানের মিয়াজাকি এবং কোচি অঞ্চলের বনে এই ছত্রাক পাওয়া যায়। জাপান পরিবেশ মন্ত্রণালয় একে বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির মধ্যে লাল তালিকাভূক্ত করেছে। এদের ফ্রুট বডি টেক্সাসে মৃত সিডার এল্ম বৃক্ষের মূলে এবং জাপানে মৃত ওক গাছে জন্মায়। এই ব্যতিক্রমী ছত্রাক সাধারণত শীতকালে দেখা যায়।

এই ছত্রাকটির শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। *Chorioactis* গণের মধ্যে একটি মাত্র প্রজাতি হচ্ছে *C. geaster*। ১৮৯৩ সালে অস্টিন, টেক্সাসে এর ফ্রুট বডি যখন প্রথম সংগৃহীত হয় তখন এই প্রজাতির নামকরণ হয়েছিল *Urnula geaster* হিসেবে, পরবর্তীতে ১৯৩৭ সালে এটি কিউসুতে পাওয়া যায়। কিন্তু এরপর ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত জাপানে এই ছত্রাক সম্পর্কে পুণরায় কোন রিপোর্ট আর পাওয়া যায় নি। এর আবিষ্কারের অল্প কয়েক বছর পরেই *Chorioactis* কে নতুন গণ হিসাবে প্রস্তাব করা হয়। ১৯৬৮ সালে একে বৈধ গণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। থলি সদশ্য গঠন অ্যাসকাসের মধ্যে অসংগতি থাকা সত্বেও *Chorioactis* কে *Sarcosomataceae* ছত্রাক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে জাতিজ্ঞান বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই ছত্রাকের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। *Chorioactis* এর সাথে তিনটি অন্য গণকে যুক্ত করে Chorioactidaceae পরিবার গঠিত হয়। পরস্পর সম্পর্কিত ছত্রাকের এই পরিবার ২০০৮ সালে স্বীকৃতি লাভ করে। ২০০৯ সালে জাপানি গবেষকগণ এই ছত্রাকের একটি গঠন আবিষ্কার করেন যেখানে এর জীবনচক্রে যৌন ধাপ অনুপস্থিত। এই অযৌন অবস্থাকে তাঁরা নামকরণ করেন *Kumanasamuha geaster*।

এই ব্যতিক্রমী ছত্রাকটি কেন শুধুমাত্র জাপান এবং মধ্য-টেক্সাস অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ তা এখনও অজানা। তবে মতবাদ আছে যে, এশিয়ান ধূলিমেঘ (Asian dust cloud) এর মাধ্যমে জাপান হতে এদের রেণু বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

চিত্র ১: (ক) সিগার আকৃতি ক্যাপসিউল। (খ) সিগার আকৃতি ক্যাপসিউল বিদীর্ণর প্রারম্ভিক ধাপ

চিত্র ২: বিদীর্ণ তারকা-আকৃতি ক্যাপসিউল

ঘৃণ্য স্বর্ণলতা

ড. নিশীত কুমার পাল
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমানের সবচেয়ে খারাপ আগাছা যা কৃষিজ ও উদ্যানতাত্ত্বিক শস্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তার একটি হলো ডডার বা স্বর্ণলতা। এটি একটি পরজীবী সপুষ্পক উদ্ভিদ। এই আক্রমনপ্রবণ আগাছা ঝোপঝাড়ের অন্য উদ্ভিদের ওপর ব্যাপকভাবে জন্মায়।

স্বর্ণলতায় সবুজ রঞ্জক পদার্থ ক্লোরোফিল না থাকায় এর পাতলা প্যাঁচানো কান্ড বর্ণহীন। কতকগুলি স্বর্ণলতা উদ্ভিদ হলুদ অথবা কমলা রঙের এবং রান্না করা স্প্যাগেটির মতো দেখতে। গ্রীষ্মমন্ডলীয় ও উপগ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে এটি প্রচুর পরিমাণে এবং শীতল এলাকায় কদাচিৎ জন্মায়।

এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Cuscuta reflexa* এবং কাসকিউটেসি গোত্রের অন্তর্গত। *Cuscuta* গণের অনেকগুলি প্রজাতি আছে (প্রায় ১৫০টি), যা দেখতে অনেকটা একই রকম। তবে ভৌগোলিক বিস্তার ও পোষক পছন্দের ব্যাপারে এদের মধ্যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

পাতলা ও পত্রবিহীন কান্ডের জন্য সহজেই স্বর্ণলতা শনাক্ত করা যায়। পাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্কপত্রে পরিণত হয়। এতে ক্লোরোফিল থাকে না বললেই চলে এবং কার্যকরভাবে সালোকসংশ্লেষণ করতে অক্ষম। তাই খাদ্য, জল, পুষ্টি উপাদান এবং ভৌত অবলম্বনের জন্য এরা সম্পূর্ণরূপে পোষক উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণেই স্বর্ণলতা বাধ্যতামূলক পরজীবী। তবে এর কুঁড়ি, ফল ও কান্ডে সামান্য পরিমাণে ক্লোরোফিল থাকে। কিন্তু এসব কলায় যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয়, উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য তার অবদান খুব সামান্যই।

বীজ থেকে নতুন স্বর্ণলতা উদ্ভিদের জন্ম হয় এবং অন্যান্য উদ্ভিদের মতোই মাটি থেকে চারা নির্গত হয়। চারা নির্গমনের পর পত্রবিহীন স্বর্ণলতার চারাগাছগুলি ঘড়ির কাঁটার দিকে পাঁচানো শুরু করে (যাকে বলে সারকামনিউটেশন), যতক্ষণ না পোষক উদ্ভিদে খিলের মতো আটকায়, প্রায়ই যা ঘটে ২৪ ঘন্টার কম সময়ে। পোষক উদ্ভিদে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত এরা খাদ্যের জন্য বীজপত্রের ওপর নির্ভরশীল। যখন স্বর্ণলতার চারা একটা পোষক উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসে, তখন এটি দ্রুত পোষক উদ্ভিদের কান্ডে নিজেকে জড়িয়ে নেয়। যেসব চারাগাছ কোনো পোষক উদ্ভিদ পায় না, তারা দশ দিনের মধ্যে মারা যায়। অবশ্য এর সঠিক সময় নির্ভর করে বাতাসের আর্দ্রতা এবং সম্ভবত বীজের আকারের ওপর।

আক্রমণপ্রবণ পরজীবী

যদি পোষক উদ্ভিদে যে খাদ্য থাকে তা স্বর্ণলতার জন্য উপকারি হয়, তাহলে এরা তাৎক্ষণিকভাবে হস্টোরিয়া বা চোষক মূল তৈরি করে। এগুলি হলো রূপান্তরিত অস্থানিক মূল যা পরিশেষে পোষক উদ্ভিদের কান্ড ভেদ করে প্রবেশ করে। স্বর্ণলতার কুন্ডলিত কান্ডের পৃষ্ট হতে স্ফীতির আকারে হস্টোরিয়া শুরু হয়। পোষক উদ্ভিদের কান্ডে পৌছানোর পর এর ফ্লোয়েম কলার সাথে (কখনো জাইলেমের সাথে) হস্টোরিয়ার সংযুক্তি ঘটে এবং তখন কার্বোহাইড্রেট, জল ও খনিজ পদার্থ শোষণ করা শুরু করে। তখন মাটিতে থাকা আদি মূল মারা যায় এবং সবশেষে এই পরজীবী মাটির সাথে সংযোগ হারায়।

স্বর্ণলতা প্রতিদিন ৩ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং পোষক উদ্ভিদ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে ক্রমাগত নতুন হস্টোরিয়া তৈরি করতে থাকে। তবে এরা কদাচিৎ পোষক উদ্ভিদকে মেরে ফেলে, যদিও ব্যাপক সংক্রমণের পর পোষক উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে যায়।

স্বর্ণলতার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (২ থেকে ৪ মিলিমিটার লম্বা) ঘন্টাকৃতির সাদা, পিঙ্ক, ক্রিম থেকে হলুদ ফুল আছে। সাধারণত জুনের প্রথম থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত ফুল দেখা যায়। কতকগুলি প্রজাতির ফুল ফোটে দেরীতে। যেমন *Cuscuta reflexa*-এর ফুল ফোটে অক্টোবর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত। ফুলের পর ছোট ছোট ফল হয়। এই ফল ছোট (প্রায় ২ থেকে ৩ মিলিমিটার চওড়া) এবং ভিতরে ১ থেকে ৪টি বীজ থাকে। ফলের ত্বক পাতলা এবং সহজেই ভেঙে যায়।

বীজ ক্ষুদ্র, হলুদ থেকে ধূসর অথবা কালো রঙের, প্রায় গোলাকার। এই বীজের আবরণ বেশ শক্ত এবং প্রচুর সংখ্যায় বীজ তৈরি হয়। বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য ভেজা মাটি ও সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়। পোষক উদ্ভিদ ছাড়াই স্বর্ণলতার বীজের অঙ্কুরোদগম হয়, যা অধিকাংশ পরজীবী উদ্ভিদ পারে না। বীজের আয়ুষ্কালের পরিসর ৬০ বছর পর্যন্ত।

ক্ষতিকর প্রভাব

সমতল ভূমি থেকে পার্বত্যাঞ্চল সকল স্থলজ পরিবেশেই স্বর্ণলতা জন্মায়। গ্রামের শস্যখেত থেকে শহরের বাড়ির বাগান, শিল্পকারখানার আশেপাশের বৃক্ষে এবং এমন কি রেললাইনের ধারের ঝোপঝাড়ে অথবা রাস্তার ধারের পথবৃক্ষেও সর্বত্রই স্বর্ণলতা দেখা যায়। গ্রীষ্মমন্ডলীয় এলাকায় এটি প্রায় ক্রমাগত বেড়েই চলে এবং গুল্ম ও বৃক্ষের ক্যানোপির ওপর পর্যন্ত পৌছাতে পারে। তবে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এরা অপেক্ষাকৃত ছোট উদ্ভিদেই সীমাবদ্ধ।

বিভিন্ন প্রকারের বন্য ও আবাদি উদ্ভিদের পরজীবী হিসেবে বাস করে স্বর্ণলতা। বিভিন্ন কৃষিজ শস্য, যেমন তুলা, পেঁয়াজ, আলু ইত্যাদি, বিশেষ করে গবাদিপশুর খাদ্য, যেমন ক্লোভার, আলফালফাতে আক্রমণ করে। বিভিন্ন প্রকার ফুল ও শোভাবর্ধক উদ্ভিদেও স্বর্ণলতা জন্মায়।

স্বর্ণলতার জীবনকাল এক বছর। আবহাওয়া শীতল হলে এটি মারা যায়। শীতকালে স্বর্ণলতা উদ্ভিদ মারা গেলেও পোষক উদ্ভিদের অভ্যন্তরে হস্টোরিয়া বেঁচে থাকতে পারে। আবার যখন আবহাওয়া উষ্ণ হয়, এরা নতুন উদ্ভিদ হিসেবে বৃদ্ধি পেতে পারে, যা ইতোমধ্যেই একটি পোষক উদ্ভিদের সাথে যুক্ত আছে। এছাড়াও, কতকগুলি প্রজাতি কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির পোষক উদ্ভিদেই বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে অধিকাংশ স্বর্ণলতা প্রজাতি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদে, একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উভয়েই, জন্মায়।

স্বর্ণলতার উপকারিতা

মানুষের কতকগুলি রোগ নিরাময়ে স্বর্ণলতা ব্যবহার করা হয়। ইউরিনারি (মূত্র সংক্রান্ত), বিলিয়ারি (পিত্ত সংক্রান্ত) এবং অন্ত্রের রোগ নিয়ন্ত্রণে স্বর্ণলতার কান্ড ও বীজ কার্যকর। বিভিন্ন প্রকারের জৈব পদার্থের উপস্থিতির জন্য স্বর্ণলতা উদ্ভিদের সকল অংশই তিক্ত স্বাদের। এতে কাসকিউটিন এবং কাসকিউটালিনের মতো উপক্ষার, কেমফেরল ও কুয়েরসেটিন সহ ফ্ল্যাভোনয়েডস এবং হাইড্রোসিনামিক অ্যাসিড এতে থাকে। অধিকন্তু, এর বীজে থাকে মোম (ইস্টার) ও অ্যামারবেলিন নামক এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ। তবে যারা হিমোরোয়িডে (রক্তক্ষরণ) ভোগেন, তাদের স্বর্ণলতার ভিত্তিতে তৈরি হার্বাল ওষুধ পরিহার করা উচিত।

সম্পূর্ণ উদ্ভিদ দিয়ে তৈরি ওষুধের বায়ুনাশক ও মৃদু মূত্রবর্ধক ধর্মাবলী আছে। এটি ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, সর্দি-কাশি নিরাময় করে এবং লিভারের কার্যকারিতাকে বৃদ্ধি করে। এছাড়াও, এর মৃদু বিরেচক প্রভাব আছে।

মূত্রনালীর সমস্যায়, জ্বর, ট্রমাটিক ব্যথা, চর্মরোগ এবং ক্ষত আরোগ্য স্বর্ণলতার কান্ডের ক্বাথ ব্যবহার করা হয়। সায়াটিকা, গাউট এবং জন্ডিসেও এই ক্বাথ কার্যকর। মাংসপেশির ব্যথা, প্যারালাইসিস, পেট ফাঁপা ও অন্ত্রের কৃমির চিকিৎসায় বীজের নির্যাস ব্যবহার করা হয়।

কতকগুলি ক্ষতিকারক আগাছার ওপর পরজীবী হিসেবে স্বর্ণলতা বাস করলে, এসব আগাছার বৃদ্ধি হ্রাস কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাই স্বর্ণলতা পরোক্ষভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

স্বর্ণলতার ব্যবস্থাপনা

ব্যাপক পরিসরের পোষক উদ্ভিদ এবং বীজের দীর্ঘকালীন সুপ্তাবস্থার কারণে স্বর্ণলতা নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন এবং এদেরকে নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব। স্বর্ণলতা প্রচুর সংখ্যায় বীজ উৎপাদন করে, যাদের সেচের জলে ও জৈব সারের মাধ্যমে সহজেই বিসরণ হয়। তাই স্বর্ণলতা একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এদেরকে ধ্বংস করা প্রায় অসম্ভব।

ভৌতভাবে অপসারণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে পোষক উদ্ভিদে একবার হস্টোরিয়া তৈরি হলে, ক্ষতি পরিহার করা খুবই কঠিন। যদি স্বর্ণলতার বীজ অঙ্কুরোদগমিত হয়ে পোষক উদ্ভিদের সাথে যুক্ত হয়, তাহলে উভয়কেই অপসারণ করার জন্য সুপারিশ করা হয়। কতিপয় শস্য, যেমন দানাশস্য, কাউপি, সয়াবিন স্বর্ণলতার আক্রমণে প্রতিরোধী, তাই জৈবিক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। স্বর্ণলতার বিরুদ্ধে কতকগুলি আগাছানাশক কার্যকর।

নাথানিয়েল ওয়ালিচ ঃ প্রখ্যাত উদ্ভিদ সংগ্রাহক

ড. নিশীথকুমার পাল

ব্রিটিশরা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস বা আইএমএস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আনুষ্ঠানিকভাবে এটি ১৭৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর একে বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রায় দুশো বছর ধরে ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্যের অগ্রগতিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। চিকিৎসা সংক্রান্ত, রুটিন কাজকর্ম ছাড়াও, এই অতিব্যস্ত ও কম বেতনের আর্মি সার্জনরা একই সাথে অন্যান্য মূল্যবান কাজকর্মও করেছেন, বিশেষ করে ভারতের ভূগোল ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে। এঁদের কেউ কেউ আগেই কাজ থেকে অবসর নিয়ে প্রত্যন্ত ও বিচ্ছিন্ন এলাকায় চিকিৎসায় ব্যস্ত না থেকে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

এ রকম একজন সার্জন যিনি আইএমএস ছেড়ে ভারতীয় উদ্ভিদ সংগ্রহ ও অধ্যয়নে নিমগ্ন ছিলেন, তিনি হলেন নাথানিয়েল ওয়ালিচ। তিনি ছিলেন সে সময়কার একজন বিখ্যাত ট্যাক্সনমিস্ট বা শ্রেণিতত্ত্ববিদ, বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক ও এনসাইক্লোপেডিয়াতে তাঁর নাম কদাচিৎ দেখা যায়। এতদসত্ত্বেও, উদ্ভিদ শ্রেণিবিন্যাসতত্ত্বের ছাত্ররা উদ্ভিদের এমন নাম প্রায়ই দেখতে পায়, যা তাঁর নামে নামাঙ্কিত। যেমন-*Wallichia densiflora, Wallichia disticha* ইত্যাদি অথবা এমন উদ্ভিদ যা তিনি নিজেই নাম দিয়েছেন, যেমন-*Didymocarpus rottlerina* Wallich, *Centranthera humifusa* Wallich ইত্যাদি।

নাথানিয়েল ওয়ালিচ ১৭৮৬ সালের ২৮ জানুয়ারি ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম উলফ ল্যাজারাস ওয়ালিচ (Wulff Lazarus wallich), তিনি ছিলেন একজন ইহুদি ব্যবসায়ী। স্কুল জীবন থেকেই নাথানিয়েলের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ জন্মে এবং তাঁর পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি ভেটেনারি মেডিসিন ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। তবে পরবর্তীতে তাঁর পিতামাতার চাপে মন পরিবর্তন করে চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়েন। ১৮০৬ সালে তিনি মাস্টার অব সার্জারি ডিগ্রি অর্জন করেন।

নাথানিয়েল যদি চিকিৎসার কাজে কোপেনহেগেনেই সারা জীবন কাটিয়ে দিতেন, তাহলে উদ্ভিদবিজ্ঞান, বিশেষ করে ভারতীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞান তাঁর অবদান থেকে অনেকখানিই বঞ্চিত হতো। তাঁর মনে যেমন ছিল প্রাকৃতিক ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ, সে রকম ছিল অভিযানের প্রতি তীব্র আখাঙ্ক্ষকা। ১৮০৬ সালে তিনি 'রয়েল সার্জন' হিসেবে নির্বাচিত হন এবং ড্যানিশ সেটেলমেন্ট ফ্রেডেরিকসনগরে (Frederiksnagar) (বর্তমানে কোলকাতার সন্নিকটে শ্রীরামপুর) যোগদান করেন। এর ফলে তিনি কোলকাতার তখনকার রয়েল বোটানিক গার্ডেনস-এর সান্নিধ্যে আসেন। সম্ভবত এই গার্ডেনস এর সাথে আরো ভালভাবে সংশ্লিস্ট হওয়ার জন্য তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সার্জন হিসেবে যোগদান করেন। এতেও তিনি পরিতৃপ্ত ছিলেন না এবং এই কাজ ত্যাগ করে বোটানিক গার্ডেনস এর সুপারিনটেনডেন্ট হন ১৮১৫ সালে। ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর তিনি এই পদে ছিলেন। এ সময়ে এখানকার জীবন্ত ও সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেন। সেই সাথে ভারতের বিশাল উদ্ভিদকূল সংগ্রহ করেন।

উদ্ভিদ সংগ্রহের কাজে তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলের দূর্গম ও বণ্যপ্রাণী সংকুল স্থান পরিদর্শন করেন। এভাবে তিনি বেশ কিছু নতুন উদ্ভিদ আবিষ্কার ও বর্ণনা করেন। তিনি হিমালয় এলাকা, গাঙ্গেয় সমভূমি, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, সিলেট এবং খাসি পাহাড় থেকে উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন। তিনি উদ্ভিদ সংগ্রহের কাজে বার্মাতেও (বর্তমানে মায়ানমার) যান। তাঁর সংগৃহিত হার্বেরিয়ামের সংখ্যা ছিল প্রায় আট হাজার।

অপর একজন উদ্ভিদ সংগ্রাহক ও শ্রেণিতত্ত্ববিদ জোসেফ ডাল্টন হুকার, যিনি পরবর্তীতে 'ফ্লোরা অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' পুস্তকটি রচনা করেন, নাথানিয়ালের সংগ্রহকে বিজ্ঞানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং তাঁর পুস্তকে নাথানিয়ালের ৩০ টি গণ অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি

তাঁর সংগৃহিত সকল উদ্ভিদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন, যা বর্তমানে 'ওয়ালিচ'স ক্যাটালগ' নামে জনপ্রিয়। বোটানিক্যাল লিটারেচারে একটি প্রমিত রেফারেন্স হিসেবে এই ক্যাটলতা কাজ করে। কিউ-এর রয়েল বোটানিক গার্ডেনস-এ 'ওয়ালিচিয়ান হার্বেরিয়াম' নামে পৃথকভাবে তাঁর সংগ্রহগুলো রাখা আছে।

গ্রীষ্মমন্ডলীয় আবহাওয়ায় দীর্ঘকাল প্রচন্ড পরিশ্রমের ফলে ওয়ালিচের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং স্বাস্থোদ্ধারের জন্য তিনি ১৮২৮ সালে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান। তবে তিনি সেখানে কেবলমাত্র বিশ্রাম করেই সময় কাটান নি। তাঁর সংগ্রহ থেকে স্পেসিমেন বিতরণ, বক্তৃতা দেওয়া, গবেষণাপত্র লেখা এবং ১৮৩০ সালে তিন খণ্ডে প্রকাশিত সম্পূর্ণ চিত্রিত ম্যাগনাম ওপাস 'Plantae Asiaticae Rariores' প্রকাশের কাজ শুরু করেন।

ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসার পরপরই ভারতের তদানিন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেনটিঙ্ক আসামে চা চাষ প্রবর্তনে নিয়োজিত বৈজ্ঞানিক মিশানের হেড হিসেবে ওয়ালিচকে নিয়োগ দেন। তবে তিনি কেবলমাত্র চা চাষের ব্যাপারেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন নি, সেই সাথে যেসব এলাকায় উদ্ভিদ সংগ্রহ অভিযান পরিচালিত হয়নি, সেসব স্থান থেকে উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন।

১৮৪৩ সালে তিনি পুনরায় ভারতবর্ষ ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত মৃদু আবহাওয়ার দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। তবে স্বাস্থ্য সমস্যা তাঁর উদ্ভিদ সংগ্রহের অদমনীয় ইচ্ছাকে দমাতে পারেনি। সেখানকার সংগৃহিত উদ্ভিদের নমুনা তিনি ইংল্যান্ড ও অন্যান্য স্থানে পাঠান।
আবার তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং ১৮৪৬ সালে সারা জীবনের জন্য ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান। ওয়ালিচ তাঁর বাকি জীবন আরাম-আয়েশ করে কাটিয়ে দেননি। তাঁর সংগ্রহ গোছানো, নতুন উদ্ভিদ প্রজাতির বর্ণনা, রিপোর্ট প্রকাশ, গবেষণাপত্র প্রকাশ, উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ইংরেজি থেকে ড্যানিশ ভাষায় অনুবাদ, গুরুত্বপূর্ণ সোসাইটিগুলো সভায় উপস্থিত হওয়া, বক্তৃতা দেওয়া-এসব কাজে তিনি সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। উদ্ভিদবিজ্ঞানে ওয়ালিচের অবদানের স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন। সম্মানজনক লিনিয়ান সোসাইটির ফেলো হন ১৮১৮ সালে, আর ১৮৪৯ সালে হন এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট। লন্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন ১৮২৯ সারে। তিনি আরো কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন।

নাথানিয়েল ওয়ালিচ

১৮১৭ সালে ভারতে এশিয়াটিক সোসাইটির ওরিয়েন্টাল মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এটি ছিল বর্তমানের কোলকাতায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের মাতৃ-প্রতিষ্ঠান। ওয়ালিচের সময়কালে খুব কম ব্যক্তিই তাঁর মতো সম্মান অর্জন করে ছিলেন। তিনি ছিলেন দয়াশীল ও বন্ধুবৎসল। ৬৮ বছর বয়সে ১৮৫৪ সালের ২৮ এপ্রিল ইংল্যাণ্ডে ওয়ালিচ মৃত্যুবরণ করেন।

ভারতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠান কোলকাতায় ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেনস-এ তাঁর একটি মূর্তি আছে।

Aspersillus *niger*

প্রফেসর ড. শামীম শামছি
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Aspersillus niger van Tiegh. Deuteromycetes শ্রেণির অন্তর্গত একটি ছত্রাক, প্রধানত এরা মৃতজীবী। পৃথিবীর সর্বত্র এবং সবখানেই এই ছত্রাকের উপস্থিতি। এরা বাতাসে, মাটিতে প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান। সব প্রকার খাদ্য সশ্যে, মাটি, ফসল কাটার পর এবং গোদাম জাত অবস্থায় এরা মিশে থাকে। তাছাড়া শাক সবজি, ফল, পাউরুটি অথবা মিষ্টান্ন দ্রব্যেও এদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

এর colony গুলি বাদামী বা কালো বাদামী রঙের। *Aspersillus niger* এর দেহ সূত্রাকার, শাখান্বিত, পার্শ্বপ্রাচীর দ্বারা বিভক্ত এবং বহুকেষী মাইসেলিরাম দ্বারা গঠিত। মাইসেলিয়ামের কিছু অংশ আক্রান্ত substrate এর উপরে থাকে এবং কিছু অংশ substrate এর মধ্যে প্রবেশ করে খাদ্য শোষণ করে।

Aspersillus এর দৈহিক মাইসেলিয়াম হতে কতকগুলি বায়বীয় hyphxe খাড়াভাবে উঠে আসে। এদেরকে conidiophore বা কনিডিয়া ধারক বলা হয়। Conidiophore এর পাদদেশে একটি স্ফীতকার কোষ থাকে যাকে বলা হয় food cell এবং এর শীর্ষে থালের মতো structureকে বলা হয় vasicle. Vasicle এর চতুর্পার্শে বোতলবাকৃতির কোষগুলোকে বলা হয় Phialede বা sterigmata, মাথায় চেইনের মত এদের conidia উৎপন্ন হয়।

Conidia গুলি এক কোষী, বাদামী বা কালো বর্ণের। এরা হালকা এবং সহজেই বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে।

কনিডিয়া গুলি basipetal ভাবে সজিত থাকে অর্থাৎ প্রথমদিকের উৎপন্নগুলি মাথায় দিকে এবং নতন কনিডিয়াগুলি গোড়ার দিকে sterigmata এর মাথায় থাকে। একসঙ্গে অনেক কনিডিয়া একত্রে শিকলের মতো অবস্থান করে। (চিত্র ১. ক ও খ)

উপযুক্ত পরিবেশ ও আশ্রয় পেলে প্রতিটি কনিডিয়া অঙ্কুরিত হয়ে নুতন উপনিবেশ (colony) তৈরী করে।

Aspersillus niger এর যৌন প্রজনন Antheridium ও Ascogonium এর সাহায্যে হয়ে থাকে। যৌন প্রজননের ফলে এর Ascocarp তৈরী করে। এটি গোলাকৃতি বিশিষ্ট এবং যার কোন opening থাকে না। এর ভেতর Ascus থাকে এবং এসকাসের ভেতর ৮টি Ascospore বিদ্যমান থাকে।

এদের Ascocarp কে cleistothecium বলা হয়। Ascocarp পরিপক্ক হলে প্রতিটি spore থেকে উপযুক্ত সময়ে এবং পরিবেশে নুতন (colony) তৈরী হয়।

Aspersillus niger সাধারণত মৃতজীবী, অথবা পরজীবী, হতে পারে। Aspersillosis নামক স্বাসতন্ত্রের জটিল ব্যাধী সৃষ্টি করে। খেতে খামারে যারা কাজ করে বা সশ্য মাড়াইয়ের সময় এই ছত্রাকের প্রচুর conidia চার পাশে ছড়িয়ে পড়ে ফলে মানুষ, গবাদি পশু, হাস মুরগী সবাই রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

বিভিন্ন সশ্য বীজে কখনও এরা পরজীবী হিসাবেও অবস্থান করে।

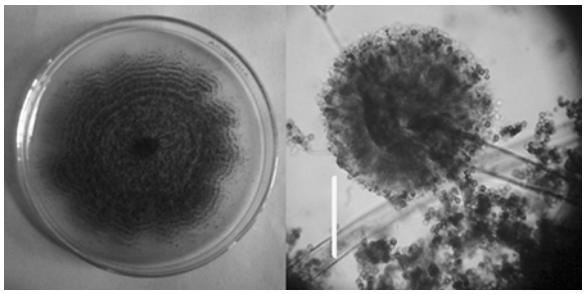

ক্ষতিকর ভূমিকা ছাড়াও এই ছত্রাকটির অনেক উপকারী ভূমিকা রয়েছে মানব কল্যাণের জন্য।

মৃতজীবী হিসাবে শাকসবজি অথবা ফলমূল, পুরানো স্যাঁতসেতে দেয়ালে যখন জন্মায় তখন এই ছত্রাকের কারণে এলার্জি হতে পারে।

ভেষজ বর্ণমালা

ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সবাইকে উদ্ভিদের প্রতি আকৃষ্ট করতে এই প্রয়াস

অ অ স্বরবর্ণ

অ–তে অর্জুন
অ–তে অশোক

অশোক ছালের অবদান
বহু রোগের সমাধান।

বুক ব্যথা, ধড়ফড়ানি ?
অর্জুন ছাল দিচ্ছি আনি।

আ আ

আ–তে আদা
আ –তে আমলকী

গরম গরম আদার চা
সর্দিজ্বর চলে যা।

আমলকী-ভিটামিন-সি এর রাজা

আদার চা খেলে কি হয়? সর্দিজ্বর ভাল হয়।
অশোক: গাঢ় লালবর্ণের পুষ্পবৃক্ষ। একটি ভালো ভেষজ উদ্ভিদ।

ই

ইসবগুল

ই–তে ইসবগুল

ই–তে ইপিকাক

কোষ্ঠকাঠিন্যে আরাম চাও
ইসবগুলের ভূষি খাও।

বমি হচ্ছে বার বার
ইপিকাক কয়েকবার।

ঈ

ঈ–তে ঈশ্বরমূল

ঈ–তে ঈষিকা

ঈশ্বরমূল গাছ

ঈষিকা

'ক্রুপ' কাশিতে ঈশ্বরমূল
ঈষিকা ফুটেছে নদীর কূল।

ঈশ্বরমূল: একটি ভেষজ লতার নাম। ঈষিকা: কাশফুল। ইপিকাক একটি হোমিও ঔষধ।

উ উ

উ–তে উচ্ছে
উ–তে উলটচন্ডাল

ডায়াবেটিসে আরাম চান
উচ্ছের রস নিত্য খান।

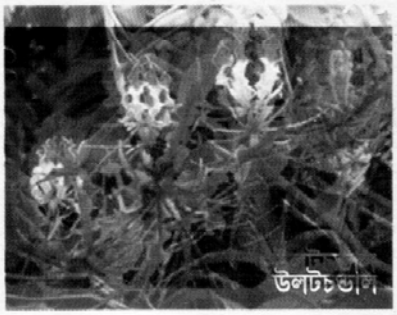

উলটচন্ডালের কত বাহার
সর্বাঙ্গে রূপ তাহার।

ঊ ঊ

ঊ–তে ঊর্ধ্বগ
ঊ–তে ঊরিধান

ঊর্ধ্বগ গুলো আকাশ চুমী
গড়ে তোলে বনভূমি।

ঊর্ধ্বগঃ অনেক উঁচু বৃক্ষ, যেমন-শাল,সেগুন,গর্জন।

ঋ ঋ

ঋ–তে ঋষ্যপ্রোক্তা
ঋ–তে ঋষ্যগন্ধা

উজাড় হচ্ছে বংশকুল
ঋষ্যপ্রোক্তার শতমূল।

শতমূলী গাছ

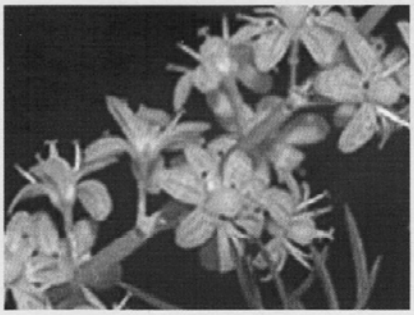

এক গুচ্ছেতে বহুমূল
নাম হয়েছে শতমূল।

শতমূলের বহুগুণ
শতেক তার ভেষজগুণ।

শতমূল

শতমূল (ঋষ্যপ্রোক্তা) একটি ভালো ভেষজ উদ্ভিদ। বন উজাড় হওয়ার সাথে সাথে শতমূলও উজাড় হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকের বাড়িতে, এমনকি বড় টবেও শতমূল জন্মানো যায়।

সুগন্ধে একাঙ্গী
এলাচ হবে তার সঙ্গী।

ঐ ঐ

ঐ–তে ঐশবৃক্ষ
ঐ–তে ঐন্দ্রী

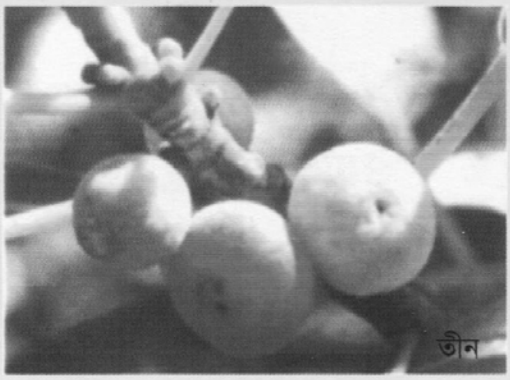

ঐশবৃক্ষ তীন জয়তুন
অনেক তার ভেষজগুণ।

ও ও

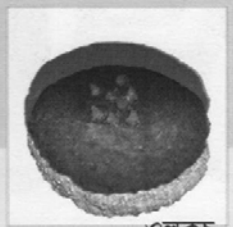

ও–তে ওলকচু
ও–তে ওলকপি

মাটির নিচের ওল কচু
ভেষজগুণ তার অনেক কিছু।
ক্ষুধা বাড়ায়, হজম বাড়ায়
পাইলস, টিউমার, হাঁপানী তাড়ায়।

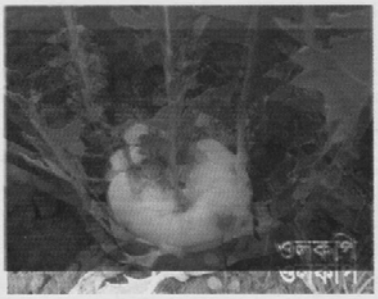

ঔ ঔ

**অসুখ হলে ঔষধ খাও
ঔষধির যত্ন নাও।**

ঔ–তে ঔষধ
ঔ–তে ঔষধি

ঔষধিঃ যে সব গাছগাছড়া দিয়ে ঔষধ তৈরি করা হয়।

গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিশেষ সম্মাননা লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের কৃতি শিক্ষক অধ্যাপক ড. শেখ শামীমুল আলম সম্প্রতি তাঁর উঁচুমানের গবেষণার জন্য বিশেষ সম্মাননা লাভ করেছেন। তাঁর এই সম্মাননা প্রাপ্তিতে আমরা সবাই গর্বিত। উদ্ভিদবার্তার পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আমরা তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি এবং ভবিষ্যতে আরও বিরল সম্মাননা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করি।

বিচারপতি ইব্রাহীম স্মারক স্বর্ণপদক

গবেষণায় অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং ক্রোমোজোম রিসার্চ সেন্টার এর পরিচালক ড. শেখ শামীমুল আলম কে গত ১৩.০১.২০১৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৯তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ সম্মানসূচক বিচারপতি ইব্রাহীম স্মারক স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাস্ট্রপতি জনাব আব্দুল হামিদ উক্ত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. শেখ শামীমুল আলমকে স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

জাপানের ওয়াদা মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড

উদ্ভিদের ক্রোমোজোম বিষয়ে বিশ্বমানের গবেষণা প্রবন্ধ রচনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ শামীমুল আলম জাপানের ওয়াদা মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন। জাপান মেন্ডেল সোসাইটির সভাপতি এবং টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তোশিউকি নাগাতা গত ২৬/০২/২০১৫ ইং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. শেখ শামীমুল আলম এর হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। জাপান মেন্ডেল সোসাইটি এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে। এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ ইমদাদুল হক এবং জাপানের সাইটোলজিয়া জার্নালের প্রধান সম্পাদক টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সিজেইউকি কাওয়ানো উপস্থিত ছিলেন। জাপানের সাইটোলজিয়া জার্নালে প্রকাশিত অধ্যাপক ড. শেখ শামীমুল আলম এর গবেষণা প্রবন্ধে সন্তুষ্ট হয়ে সেদেশের ওয়াদা মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড কমিটি তাঁকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য জাপান মেন্ডেল সোসাইটির সভাপতি এবং সাইটোলজিয়া জার্নালের প্রধান সম্পাদক বাংলাদেশ সফরে আসেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ শামীমুল আলম এর গবেষণা প্রবন্ধকে স্বীকৃতি দেওয়ায় জাপানের ওয়াদা মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড কমিটিকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরো জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

স্টাডী ট্যুর কড়চা

আকাশ ছোঁয় পাহাড় নাকি ছোঁয় পাহাড়ের বাড়ি,
সেই ভাবনায় শেষ ক'টাদিন গেল তাড়াতাড়ি ।
ব্যাগ বোস্কা নিয়ে যখন তৈরী স্বপ্ন ফেরী,
ছারপোকা নিয়ে ট্রেন তখন আসতে করলো দেরি ।

রাত কেটে গেলো, ঘুম নেমে এলো, ছারপোকা হলোনা দমন,
এরই মাঝে শুরু হয়ে গেলো রাঙ্গামাটি ভ্রমণ ।
অনেক ঠেলায় দুপুর বেলায়, চাঁট গায়ের দেশে,
ডিম খিচুড়ী খেয়েই গেলাম সে শহর ফেলে এসে ।
ঝিমিয়ে তখন রাস্তায় কখন, শুরু হলো ঢেউ,
বেলার শেষে হাসবে পাহাড় ভেবেছিলো কি কেউ ।

অহংকারী পাহাড়গুলোর রাস্তা খানদানী,
বাস বেচারার চলতে সেথা খুব পেরেশানি,
পাহাড় ঘেঁষে এক বাড়িতে মোদের আস্তানা ।
বারান্দাতে দাড়িয়ে যায় পাহাড়দের চেনা ।

পরের দিনই রাম পাহাড়ের পেটে দিলাম হানা,
জঙ্গলের ভিতরে শুধু হারাতে ছিলো মানা ।
সীতা পাহাড়, ঈর্ষা তার, লেকের ওপারে দাঁড়া,
দূর থেকে হাত দেখিয়ে ছবি তোলার তাড়া,
কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্র বইতে ছিলো পড়া,
এসে এবার জেনে নিলাম গেটের নড়াচড়া ।
সেই সাথে কিনা এখানের মিঠাই চেখে দেখা,
এমন মিঠাই বইতে কেনো কোথাও নেই লেখা?

ঝুলন্ত ব্রীজ কিভাবে ঝোলে কাপ্তাইয়ের লেকে,
প্রশ্ন ছিলো এতজন দেখে ব্রীজ যাবে কি বেঁকে?
ছোট্ট ব্রীজ, বাইশ গজ ক্রীজ, বড় প্রবেশ গেট,
সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম উপজাতি মার্কেট ।
কেনাকাটা, জ্যাকসন ড্যান্স, রেস্ট হাউজের মজা,
পরের দিন দেখা যাবে কে সুভলংয়ের রাজা ।

গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মাঝে লঞ্চে শুরু সেই যাত্রা,
দমকা বাতাস বাড়িয়ে দিলো আনন্দের মাত্রা ।
দূর থেকে ঝর্ণা দেখার গল্প বলা শেষ,
ঝর্ণা ডাকে কলকল করে নাকি গান জানে বেশ ।
কখন কে যে লাফিয়ে পড়ল ঝর্ণা মেখে নিতে,
কেউবা তোলে সেলফি আবার কেউ কাঁপে শীতে ।

উদাম দেহে ঠান্ডা কি হে কাপড় দিয়ে শুকা,
সবাই সলাপ, লটারী আলাপ, স্বজনপ্রীতি ধোকা ।
নাচ হলো, গান হলো, ছিলো আনারস আম,
ট্যুরেতে তখনো বাজছিলো বাঞ্চীতা চাকমার নাম ।

সন্ধ্যাবেলা যাবার মেলা ভোজন হলো বেশ,
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করে ট্যুরের হলো শেষ,
সবারই আছে ছবি অনেক হাজারখানেক গল্প ।
আছে খুব হাসাহাসি মনকষাকষি স্মৃতি দিয়ে ঘেরা,
দু'খানা আনারস হাতে ঝুলিয়ে অত:পর ঘরে ফেরা ।

৩য় বর্ষ সম্মান ২০১৫-এর
ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতি মুখ

উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে (ঢা. বি.) প্রভাষক পদে যোগদান

কিশোয়ার জাহান সিঁথি

কিশোয়ার জাহান সিঁথি গত ৩০ এপ্রিল ২০১৫ ইং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তার জন্মস্থান ঢাকা এবং আদি বাসস্থান কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। তিনি জনাব এ, কে, এম, কামালউদ্দীন এবং মনিরা মহীউদ্দীন এর তিন সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ্য। তিনি পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মিশনারী স্কুল সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস হাই স্কুল হ'তে কৃতিত্বের সহিত ২০০২ সালে এস. এস. সি. এবং মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ হ'তে ২০০৪ সালে এইচ. এস. সি. পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে ২০০৩-২০০৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি হয়ে ২০০৯ সালে অত্র বিভাগ হতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এসসি. (সম্মান) ডিগ্রী অর্জন করেন। একই বিভাগে প্ল্যান্ট ব্রিডিং এন্ড বায়োটেকনোলজী গবেষণাগারে প্রফেসর ড. রাখহরি সরকার-এর তত্ত্বাবধানে মসুর ডালের জেনেটিক ট্রান্সফরমেশন এর উপর থিসিস করেন এবং ২০১১ সালে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার পূর্বক এম.এস. ডিগ্রী অর্জন করেন। বি. এসসি. (সম্মান) এ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ হ'তে সম্মানজনক গোল্ডেন জুবলী এ্যাওয়ার্ড ২০০৮ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদ হ'তে ডিন্স এ্যাওয়ার্ড ২০০৮ লাভ করেন। এম.এস. গবেষণা কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে এন.এস.টি. ফেলোশীপ পান। তিনি আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত অত্যন্ত স্বনামধন্য কমনওয়েলথ স্কলারশীপ প্রাপ্ত হয়ে ইংল্যান্ডের ইমপেরিয়াল কলেজ অব লন্ডন হতে এম. রিসার্চ ডিগ্রী অর্জন করেন। ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের মার্চ পর্যন্ত তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের প্ল্যান্ট ব্রিডিং এন্ড বায়োটেকনোলজী গবেষণাগারে রিসার্চ এসোসিয়েট হিসাবে গবেষণারত ছিলেন। তিনি ব্যক্তি জীবনে বিবাহিতা এবং তার স্বামী বি.সি.এস.আই.আর. এ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে কর্মরত আছেন। কিশোয়ার জাহান সিঁথি তার সুন্দর ভবিষ্যৎ এবং সাফল্যমন্ডিত কর্মজীবনের জন্য সকলের দোয়া প্রার্থী।

০০০

তাহসিন খান

তাহসিন খান গত ৩০ এপ্রিল ২০১৫ ইং তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি জনাব নেয়াজ আক্তার খান এবং শামীমা সুলতানা এর দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ। তার জন্মস্থান ঢাকা। তাহসিন খান বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে ২০০৬ সনে গোল্ডেন জি.পি.এ. ৫.০০ সহ এস.এস.সি. পাশ করেন এবং নটরডেম কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে ২০০৮ সনে জি.পি.এ. ৫.০০ সহ এইচ.এস.সি. পাশ করেন। তাহসিন খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ হতে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে সি.জি.পি.এ. ৩.৮৭ লাভ করে বি.এস. (অনার্স) পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি একই বিভাগে Microbiology Laboratory তে অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা এর তত্ত্বাবধানে এম.এস. গবেষণা

কার্য সম্পন্ন করেন এবং ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে জি.পি.এ. ৩.৯৩ লাভ করে এম.এস. পাশ করেন। তিনি বি.এস. (অনার্স) এ অসাধারণ কৃতিত্তের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর জীববিজ্ঞান অনুষদ হতে ডিন'স এওয়ার্ড অর্জন করেন। তিনি এম.এস. গবেষণার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে এন.এস.টি. ফেলোশীপ পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি মাইক্রোবিয়াল বায়োটেকনোলজি বিষয়ে গবেষণারত আছেন। তিনি বিবাহিত। তার স্ত্রী তাজরিনা জাহান চৌধুরী একই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী। তাহসিন খান তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং সাফল্য মণ্ডিত কর্ম জীবনের জন্য সকলের দোয়া প্রার্থী।

ooo

ড. তাহমিনা ইসলাম

ড. তাহমিনা ইসলাম গত ৩০ মার্চ ২০১৫ ইং তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি জনাব সেলিম পারভেজ এবং মিসেস জাহানারা ইসলাম এর তিন সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তার জন্মস্থান ঢাকা। ড. তাহমিনা ইসলাম ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ল্যাবরেটরি স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে ২০০১ সনে এস.এস.সি. পাশ করেন এবং এস ও এস হারমান মেইনার কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে ২০০৩ সনে এইচ.এস.সি. পাশ করেন। ড. তাহমিনা ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ হতে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে বি.এস.সি. (অনার্স) পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি একই বিভাগ এ Plant Breeding and Biotechnology Laboratory তে অধ্যাপক ড. রাখহরি সরকার এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা সম্পন্ন করে ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে এম.এস. প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। তিনি বি.এস.সি. (অনার্স) এ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর জীববিজ্ঞান অনুষদ হতে ডিন'স এওয়ার্ড অর্জন করেন। তিনি এম.এস. গবেষণার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে এন.এস.টি. ফেলোশীপ লাভ করেন। তিনি International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Italy থেকে ফেলোশীপ গ্রহণ করে জওহর লাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়া দিল্লী থেকে ২০১৫ সালে পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়া তিনি ছাত্রজীবনে বিতর্ক, উপস্থাপনা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে তিনি Plant Molecular Biology বিষয়ে গবেষণারত আছেন। ড. তাহমিনা ইসলাম তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং সাফল্য মণ্ডিত কর্ম জীবনের জন্য সকলের দোয়া প্রার্থী।

ooo

নাদারা তাবাস্‌সুম

নাদরা তাবাসসুম গত ৩০ মার্চ ২০১৫ ইং তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি জনাব মোঃ শাহজাহান ফিরোজ এবং মিসেস মাছুদা ফিরোজ এর তিন সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তার জন্মস্থান চাঁদপুর। নাদরা তাবাসসুম মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে ২০০৪ সনে এস.এস.সি. পাশ করেন এবং মতিঝিল আইডিয়াল কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে ২০০৬ সনে এইচ.এস.সি. পাশ করেন। নাদরা তাবাসসুম ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ হতে ২০১০ শিক্ষাবর্ষে বি.এস.সি. (অনার্স) পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি একই বিভাগ এ Plant Breeding and Biotechnology Laboratory তে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম এর তত্ত্বাবধানে এম.এস. গবেষণা সম্পন্ন করেন এবং ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে জিপিএ ৪.০ লাভ করে এম.এস. পাশ করেন।তিনি ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে Imperial College London, England থেকে Molecular Plant and Microbial Science এ MRes ডিগ্রী অর্জন করেন।তিনি বি.এস.সি. (অনার্স) এ অসাধারণ কৃতিত্ব রাখার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর জীববিজ্ঞান অনুষদ হতে ডিন'স এওয়ার্ড অর্জন করেন। তিনি এম.এস. গবেষণার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে এন.এস.টি. ফেলোশীপ লাভ করেন। এছাড়া তিনি ছাত্রজীবনে বিতর্ক, উপস্থাপনা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। নাদরা তাবাসসুম তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং সাফল্য মণ্ডিত কর্ম জীবনের জন্য সকলের দোয়া প্রার্থী।